

ইমাম,
ইমামতি
ও
মুক্তাদীর
করণিয় ।

ডা. এম. এ. ইসলাম



ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ২

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয়

লেখক: আব্দুর রাকীব (মাদানী)

সম্পাদক: আব্দুল্লাহিল হাদী

দাঈ, দাওয়াহ সেন্টার, খাফজী, সউদী আরব।

বিঃ দ্রঃ লেখকের ভিডিও লেকচার শুনতে ইউটিউব সার্চে লিখুন

Abdur Raquib Bokhari-Madani

প্রচ্ছদঃ রোকমুজামান রোকন,

প্রচারেঃ ইকরা ১১.৬.২০১৫

<https://www.facebook.com/pages/IQRA/760922900642662?ref=bookmarks>

সংকলণে :

ডা.এম.এ.ইসলাম

সূচিপত্রঃ

পৃষ্ঠা

ভূমিকাঃ-----৫

ইমাম শব্দের আভিধানিক অর্থঃ-----৬

ইমামতির পারিভাষিক অর্থঃ-----৬

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৩

নামাযের ইমামতের গুরুত্ব ও ফযীলতঃ-----	৭
ইমামতীর অধিক হকদার কে?-----	৭
ইমামের বেতন-ভাতাঃ-----	৯
ইমামতি ছাড়া ইমামের কিছু পছন্দনীয় কাজঃ-----	১২
যে সব কাজ থেকে ইমামকে বিরত থাকা উচিতঃ-----	১৩
যার অবস্থা অজ্ঞাত, এমন ইমামের পিছনে নামাযঃ-----	১৪
শির্ককারী ইমামের পিছনে নামাযঃ-----	১৫
ফাসেক এবং বিদআতী ইমামের পিছনে নামাযঃ-----	১৫
নাবালেগের ইমামতীঃ-----	১৭
অন্ধ ব্যক্তি ও দাসের ইমামতিঃ-----	১৭
বোবা ও বধির ব্যক্তির ইমামতিঃ-----	১৮
মহিলার ইমামতিঃ-----	১৮
রুকু, সাজদা, কিয়াম, কুউদ করতে অপারগ ব্যক্তির ইমামতিঃ-----	১৯
উম্মী তথা অজ্ঞ ব্যক্তির পিছনে নামাযঃ-----	১৯
নামাযের পূর্বে ইমামের করণীয়ঃ-----	২০
নামাযরত অবস্থায় ইমামের করণীয়ঃ-----	২৩
ইমামতির বিবিধ মাসাইলঃ-----	২৬
যে ইমামকে মুসল্লীগণ অপছন্দ করে তার ইমামতিঃ-----	২৬
নফল নামায পাঠকারীর পিছনে ফরয সালাত আদায় করাঃ-----	২৭
ফরয সালাত আদায়কারীর পিছনে নফল সালাত আদায় করাঃ-----	২৭
মুক্তাদী সংক্রান্ড মাসআলা-মাসাইলঃ-----	৩০
মুক্তাদীগণ নামাযের উদ্দেশ্যে কখন কাতারবদ্ধ হবেন?-----	৩০
ইমামের অনুসরণ করা মুক্তাদীদের অবশ্য কর্তব্য :-----	৩১
ইমামের অনুসরণের ক্ষেত্রে মুক্তাদীদের অবস্থা চার ভাগে বিভক্তঃ-----	৩১
ইমামের পিছনে মুক্তাদীগণের সূরা ফাতিহা পাঠঃ-----	৩২
ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের সশব্দে আমীন বলাঃ-----	৩৫
ইমামের ভুল হলে মুক্তাদীদের সংকেত দেওয়াঃ-----	৩৯
ইমামের কিরাআতে ভুল হলে স্মরণ করিয়ে দেওয়াঃ-----	৪০
যে ব্যক্তি কোন খতীবকে বিভ্রান্তির দিকে অথবা বিদআতের দিকে আহ্বান করতে শুনে সে কি করবেঃ-----	৪১
যে খতীব তার খোতবার মাঝে অথবা গোটা খোতবা জুড়ে শুধু ইসরাইলী বর্ণনা ও দুর্বল হাদিস উল্লেখ করে এর মাধ্যমে মানুষকে চমকে দিতে চান ইসলামে এর হুকুম কী?-----	৪৪
মুক্তাদীদের ভুল-ত্রুটিঃ-----	৪৪
মাসবুকের বিধানঃ-----	৪৫
মাসবুক ব্যক্তির সামনের কাতারে স্থান না পেলে পিছনে একাই দাঁড়ানোঃ-----	৪৬
রুকু পেলে রাকাতাত গণ্য করাঃ-----	৫০
জুমআর এক রাকাতাত নামায ছুটে গেলেঃ-----	৩
ঈদের নামাযের মাসবুকঃ-----	৫৩
জানাযার নামাযের মাসবুকঃ-----	৫৩
‘সাহ্’ ও সাজদায়ে সাহ্ঃ-----	৫৪
চাঁদ-তারার নকশা আছে এমন জায়নামাযে নামায অবৈধ মনে করাঃ-----	৬০
ইমাম ও মুক্তাদীর লাইন সোজা ও বরাবর না করাঃ-----	৬১

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৪

বিশেষ শব্দের মাধ্যমে বিভিন্ন নামাযের নিয়ত পড়াঃ-----	৬১
তাকবীর বলার সময় আল্লাহ আকবার এর (বা) টেনে পড়াঃ-----	৬১
তাকবীরে তাহরীমার সময় কান স্পর্শ করা এবং হাতের তালু চিপের দিকে রাখাঃ-----	৬২
এমন বিশ্বাস রাখা যে, মুয়াজ্জিন ব্যতীত অন্য কেউ ইকামত দিতে পারে নাঃ-----	৬২
নামাযে কিরাআত, দুআ ও যিকর পড়ার সময় জিহ্বা না নাড়িয়ে মনে মনে পড়াঃ-----	৬২
ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের তাকবীর, রাব্বানা ওয়ালাকাল্ হাম্দ সহ ইত্যাদি দুআ-যিকর সশব্দে পড়াঃ-----	৬২
নামাযে চোখ বন্ধ রাখা কিংবা আকাশের দিকে দেখাঃ-----	৬৩
ফরয নামাযান্বেই ইমাম ও মুক্তাদীদের হাত তুলে সম্মিলিত দুয়াঃ-----	৬৬
সালাম শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করতেনঃ-----	৬৭
নামায শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক কুরআনের কিছু অংশ ও সূরা পড়ার বর্ণনাঃ-----	৬৮
সালামের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে দুয়ার প্রমাণঃ-----	৬৯
দুয়ার প্রমাণ থাকলেই কি হাত তুলে দুয়া করা বৈধ হয়?-----	৭০
ফরয নামায শেষে দুয়ার দলীলগুলির অবস্থাঃ-----	৭২
জুমার সালাত আদায়ের আগে ওয়াজ-নসীহত করার বিধান কি?-----	৭৬
ইমাম সাহেবের মাতৃভাষায় জুমার খুতবা দেয়ার বিধানঃ-----	৭৭

ভূমিকাঃ

আল হাল হামদুলিল্লাহ, ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আলা রাসুলিল্লাহ, আশ্মা বাদঃ
ইমাম ও ইমামতি ইসলাম ধর্মের এবং মুসলিম সমাজের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুল
প্রয়োজনীয় বিষয়। একটি দেশ থেকে নিয়ে একটি গ্রাম পর্যন্ত এমনকি একটি পরিবারেও এই
পদের প্রয়োজনীয়তা লক্ষণীয়। তাই এই বিষয়টির সম্পর্কে আমাদের সমাজের প্রত্যেক
ইমামকে বিশেষ ভাবে এবং অন্যান্য মুসলিমদের সাধারণ ভাবে জ্ঞান রাখা আবশ্যিক। উক্ত
কারণে বিষয়টির অবতারণা আল্লাহ যেন সঠিক লেখার এবং তার প্রতি আমল করার
তাওফীক দেন। আমীন।

-লেখক: আব্দুর রাকীব (মাদানী)

ইমাম শব্দের আভিধানিক অর্থ: আরবী ভাষার বিশিষ্ট অভিধান ‘লিসানুল আরবে’ উল্লেখ হয়েছে, ‘মানুষ যার অনুসরণ করে, তাকে ইমাম বলে’।

ইবনু সীদাহ বলেন: ‘প্রধান ব্যক্তি কিংবা মানুষের অনুকরণীয় ব্যক্তিকেই ইমাম বলা হয়। এর বহুবচন হচ্ছে, ‘আইম্মাহ’-ইমামগণ। [লিসানুল আরব, ইবনে মনজুর, ১২/২৪]

ফিকাহ বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, ইমাম তাকেই বলা হয় কোন সম্প্রদায় যার অনুসরণ করে। সেই সম্প্রদায় সঠিক পথের অধিকারী হোক অথবা পথ ভ্রষ্ট হোক হোক।

সঠিক পথের অধিকারী অর্থে আল্লাহ বলেছেন: “আর তাদের বানিয়েছিলাম ইমাম (নেতা) তারা আমার নির্দেশে মানুষকে সঠিক পথ দেখাত।” [আম্বিয়া/৭৩]

পথ ভ্রষ্ট অর্থে: আল্লাহ বলেন: “আমি তাদের ইমাম (নেতা) করেছিলাম। তারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত, কিয়ামতের দিন তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।” [কাসাস/৪১] ফিকহিস্বকোষ, ৬/২১৬-২১৭।

আর ইমামাহ-প্রচলিত ভাষায় যাকে আমরা ইমামতি বলি- তা আরবী আম্মা-ইয়াউম্মু শব্দের মাসদার বা উৎস, যার আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা। শব্দটি অগ্রবর্তী হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আরবী ভাষায় বলা হয়, আম্মাহুম এবং আম্মা বিহিমঃ অর্থাৎ যখন সে অগ্রবর্তী হয়। [ঐ, ৬/২০১]

ইমামতির পারিভাষিক অর্থ:

ফকীহ তথা ইসলামী বিদ্বানগণের পরিভাষায় ইমামত দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা:

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৬

১.ইমামা কুবরা (বড় ইমামত)

২.ইমামা সুগরা (ছোট ইমামত)।

ইসলামী পরিভাষায় বড় ইমামত হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিনিধি হিসাবে দ্বীন ও দুনিয়ার সাধারণ নেতৃত্ব প্রদানকরা। [পাণ্ডুলিপি ৬/২১৬]
যাকে খলীফা, রাষ্ট্রপ্রধান বা দেশের প্রধান নেতা বলা যেতে পারে।

আর ছোট ইমামত হচ্ছে নামাযের ইমামত। যে ব্যক্তি নামাযের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয় আর নামাযীরা তাঁর অনুকরণ করে থাকে। যেহেতু তিনি অনুকরণীয় এবং অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী সেহেতু তাঁকে ইমাম বলা হয়।

অবশ্য ইমাম শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। শব্দটির আভিধানিক অর্থকে কেন্দ্র করে এমন ব্যক্তিকেও ইমাম বলা হয়, যে বিশেষ জ্ঞানে পারদর্শী এবং সেই জ্ঞানে সে অনুকরণীয়। তাই হাদীস শাস্ত্রে বুখারী (রহ) কে ইমাম বুখারী বলা হয়। ফিকাহ শাস্ত্রে আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ইত্যাদি উলামাগণের নামের গুরুত্রে ইমাম লেখা হয়। এ সবই এই শব্দের ব্যাপক ব্যবহারের উদাহরণ। তবে আলোচ্য বিষয়ে আমরা ছোট ইমামত তথা নামাযের ইমামতের আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ।

নামাযের ইমামতের গুরুত্ব ও ফযীলতঃ

১- ইমামতি করা দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা স্বয়ং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সারা জীবন করে গেছেন। অতঃপর তাঁর মৃত্যুর পর চার খলীফা তা সম্পাদন করেছেন এবং এখনও মুসলিম সমাজের উত্তম ব্যক্তিরাই সাধারণত: সেই উত্তম কাজটি পালন করে থাকেন।

২- পাঁচ ওয়াক্ত নামায সম্পাদন করা ইসলামের দ্বিতীয় রোকন এবং ইসলামের স্পষ্ট প্রতীক যা মহান আল্লাহ জামাতাবদ্ধ ভাবে আদায় করার আদেশ করেছেন। আর সেই আদেশ ইমাম ব্যতীত বাস্তবায়িত

হয় না।

৩- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমাম ও মুয়াযযিনের জন্য এই বলে দুয়া করেন:

أُخْرِجْهُ “لِلْمُؤَذِّنِينَ وَاعْفِرْ الْأُئِمَّةَ أَرْشَدَ اللَّهُمَّ، مُؤْتِمِنًا وَالْمُؤَذِّنَ ضَامِنًا الْإِمَامَ”
وَالْتَرْمِذِي أَبُو دَاوُدَ

“ইমাম হচ্ছে জিম্মাদার আর মুয়াজ্জিন আমানতদার, হে আল্লাহ! তুমি ইমামদের সঠিক পথ দেখাও কর এবং মুয়াজ্জিনদেরকে ক্ষমা কর”। [আবু দাউদ, নং ৫১৭ / তিরিমিযী, নং ২০৭/ সহীহ সুনান আবুদাউদ, ১/১০৫]

ইমামতীর অধিক হকদার কে?

এ প্রসঙ্গে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

بِالسَّنَةِ فَأَعْلَمُهُمْ سِوَاءَ الْقِرَاءَةِ فِي كَانُوا فَإِنَّ اللَّهَ، لِكِتَابِ أَفْرَنْهُمْ الْقَوْمَ يَوْمُ
سِوَاءَ الْهَجْرَةِ فِي كَانُوا فَإِنَّ هَجْرَةَ فَأَقْدَمُهُمْ سِوَاءَ السَّنَةِ فِي كَانُوا فَإِنَّ
بَيْتِهِ فِي يَقْعُدَ لَا وَ، سُلْطَانَهُ فِي الرَّجُلِ الرَّجُلُ يَوْمَ لَا، سَلَمًا فَأَقْدَمُهُمْ
[مسلم رواه] “بِإِذْنِهِ إِلَّا تَكْرِمَتُهُ عَلَى

“লোকদের ইমামতি করবে ঐ ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে আল্লাহরকিতাব সব চেয়ে বেশী পাঠ করতে পারে। যদি তারা পাঠ করার ক্ষেত্রে সমমানের হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যে সুনুতের

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৭

অধিক জ্ঞানী হবে সে ইমামতি করবে। যদি সুন্নতের জ্ঞানে সকলে বরাবর হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যে সর্বপ্রথম হিজরতকারী সে ইমামতি করবে। যদি তারা সকলে হিজরতের ক্ষেত্রেও বরাবর হয় তবে তাদের মধ্যে আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে সে তাদের ইমামতি করবে। কোন ব্যক্তি যেন কোন ব্যক্তির অধীনস্থ স্থানে তার অনুমতি ব্যতীত ইমামতী না করে এবং কোন ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত আসনে যেন তার অনুমতি ব্যতীত না বসে”।

[মুসলিম, অধ্যায়, মাসাজিদ এবং নামাযের স্থান সমূহ, হাদীস নং ৬৭৩]

সহীহ মুসলিমে এই বর্ণনার ঠিক পরের বর্ণনায় আগে ইসলাম গ্রহণের স্থানে বয়সে বড় শব্দটি এসেছে।

উপরের বর্ণনানুযায়ী ইমামতির বেশী হকদার ব্যক্তিবর্গের ধারাবাহিকতা এইরূপ:

১- কুরআন সব চেয়ে বেশী পাঠকারী। এখানে সব চেয়ে বেশী পাঠকারী বলতে যার কুরআন সব চাইতে বেশী মুখস্থ আছে তাকে বুঝানো হয়েছে। কারণ আমার বিন সালমার হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদেশ এই ভাবে উল্লেখ হয়েছে, “যখন নামাযের সময় হবে, তখন তোমাদের মধ্যে কেউ আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যার অধিক কুরআন মুখস্থ আছে সে ইমামতি করবে”।

[বুখারী, অধ্যায়, মাগাযী, হাদীস নং ৪৩০২]

২- সকলে কুরআন মুখস্থের ক্ষেত্রে সমান হলে সুন্নতের ব্যাপারে অধিক জ্ঞানী।

৩- সুন্নতের জ্ঞানেও সকলে বরাবর হলে যে ব্যক্তি কুফরের দেশ হতে ইসলামের দেশে আগে হিজরতকারী।

৪- হিজরতের ক্ষেত্রে সকলে বরাবর হলে, যে ইসলাম গ্রহণে অগ্রবর্তী।

৫- আর ইসলাম গ্রহণে সবাই বরাবর হলে, যে বয়সে বড়। যেমন সহীহ মুসলিমের পরের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

উপরে বর্ণিত পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের তরতীব নির্ণয়ে বিভিন্ন উলামা ও মাজহাবের কিছু মতভেদ থাকলেও হাদীসে বর্ণিত ধারাবাহিকতা প্রাধান্য পাবে। তবে চতুর্থের স্থানে পঞ্চম হওয়ার সম্ভাবনা হাদীস দ্বারা স্বীকৃত। অর্থাৎ হিজরতের দিক দিয়ে সকলে বরাবর হলে বয়সে বড় বেশী হকদার না ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী হকদার? এ বিষয়ে হাদীসের শব্দের ধারাবাহিকতায় পার্থক্য দেখা যায়। তাই কেউ বয়সে বড়কে প্রাধান্য দিয়েছে আর কেউ ইসলাম আগে গ্রহণকে প্রাধান্য দিয়েছে। [শারহ মুসলিম, ৫ম খন্ড, ১৭৫-১৭৭/ আর রাওয়া আন নাদিয়্যাহ, মুহাম্মদ সিদ্দীক হাসান খান, ১/৩২০/ মুগনী, ইবনু কুদামাহ, ৩/১১১৬]

উপরোক্ত বিষয়ে আরো কিছু তথ্য:

ক- উপরোক্ত ধারাবাহিকতা বজায় রাখার আদেশ মোস্‌ড়াহাব আদেশ, শর্ত নয় আর না ওয়াজিব। তাই অগ্রাধিকার প্রাপ্তের উপস্থিতিতে অনগ্রাধিকার প্রাপ্তের ইমামতি ফুকাহাদের সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। [আল্ মাওসুআহ আল ফিকহিয়্যাহ, ৬/২০৯]

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় চ

খ- এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা তখন প্রযোজ্য হবে, যখন মসজিদে নির্ধারিত ইমাম থাকবে না। আর যদি মসজিদে ইমাম নির্ধারিত থাকে তাহলে সেই ইমামতি করার বেশী অধিকার রাখে; যদিও তার থেকে বেশী কুরআন পাঠকারী ও সুন্নত তথা অন্যান্য গুণের লোক উপস্থিত থাকে। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: “কোন ব্যক্তি যেন কোন ব্যক্তির অধীনস্থ স্থানে কখনো ইমামতি না করে।”

[শারহ মুসলিম, ৫/১৭৭]

গ- হ্যাঁ, তবে সেই স্থানে যদি বড় ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) উপস্থিত হন, তাহলে নির্ধারিত ইমামও আর ইমামতি করার বেশী হোকদার হবে না; বরং সেই বড় ইমাম তখন ইমামতি করার বেশী হকদার হবেন। কারণ তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ব্যাপক।

[নায়লুল আউতার, ৩/২০২/ শারহ মুসলিম, ৫/১৭৭]

ঘ- হাদীসে বর্ণিত উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যে যদি সকলে সমান হয়, তাহলে কী করতে হবে? এ বিষয়ে সেই হাদীসে আরো কিছু বলা হয় নি। তবে অন্যান্য দলীলের আলোকে ইসলামী পন্ডিতদের অনেকে মনে করেন, তাহলে তাদের মধ্যে অধিক পরহেজগার ব্যক্তি অগ্রাধিকার পাবে। কারণ আল্লাহ বলেন: “অবশ্যই আল্লাহনিকট তোমাদের মধ্যে অধিক আল্লাহভীরুই বেশী সম্মানীয়।” [আল হুজুরাত/১৩] এর পরেও সকলে বরাবর হলে তাদের মাঝে লটারি করতে হবে। সাহাবী সাআ’দ বিন অক্কাস (রাযিঃ) একদা আযানের ব্যাপারে লটারি করেন। তাই আযানের ক্ষেত্রে এমন করা বৈধ হলে ইমামতির ক্ষেত্রে বেশী বৈধ হবে।

[মুগনী, ৩/১৬]

উল্লেখ্য যে, হানাফী মাজহাবের বিভিন্ন ফিকহের বইতে উপরে বর্ণিত হাদীসের ৪-৫ টি পদ্ধতির শুধু ধারাবাহিকতাই রক্ষা করা হয় নি; বরং তারা রায় ও কিয়াসের অশ্রয় নিয়ে ২০টিরও অধিক পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, যাতে এমন কিছু বিষয় লিখেছেন যা রহস্যময়, লজ্জা জনক এবং অযৌক্তিক। যেমন দররে মুখতারের লেখক সেই সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে চেহারা-ছবি সুন্দর হওয়া, স্ত্রী সুন্দরী হওয়া এমন কি মাথা বড় হওয়া এবং যৌনাঙ্গ ছোট হওয়ার মত অযৌক্তিক ও লজ্জা জনক গুণাগুণকেও ইমামতির অগ্রাধিকারের কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। [দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, পৃঃ ৯৫, যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দের ছাপা/ ভুরীকে মুহাম্মদী, মুহাম্মদ জুনাগড়ী, ১৬২-১৬৮/ সালাফিয়াত কা তাআরুফ, ড.রোয়াউল্লাহ, ২৭২-২৭৭]

ইমামের বেতন-ভাতা:

ইমামের অবস্থা হিসাবে এ বিষয়ের বিধান প্রযোজ্য হবে। একজন ইমামের সাথে মোটামুটি নিম্নের অবস্থাগুলি সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে।

১- যদি ইমাম কেবল পার্থিব উদ্দেশ্যেই ইমামতি করে, তাহলে তা হারাম ও বড় গুনাহ। মনে রাখা উচিত যে, ইমামতি করা এবং আযান দেওয়া, উভয় শারয়ী কাজ এবং তা নিঃসন্দেহে ইবাদত। আর ইবাদত কবুলের প্রথম শর্তই হচ্ছে, ইখলাস। অর্থাৎ যে কোন ইবাদত তা যেন কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হয়, অর্থ পাবার উদ্দেশ্যে কিংবা পদ লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা নিজের সুন্দর কর্ত্ত্বের মাধ্যমে লোকের প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্য থাকলে, তাতে আর ইখলাস থাকে না। যার ফলে ইবাদতটি কবুল হয় না এবং তা ছোট শিরকে পরিণত হয়। কারণ ইবাদত, যা কেবল আল্লাহর জন্যই খাঁটি ভাবে হওয়া

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৯

কাম্য, তাতে সে পার্থিব উদ্দেশ্য অংশী করেছে। তাই আক্বীদার পন্ডিতগণ বলেন: মূল ইবাদতের মাধ্যমে কেবল দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্য, যেমন হজ্জ করা পয়সার জন্য, জিহাদ করা গনিমতের সম্পদ পাওয়ার জন্য, অনুরূপ ইমামতি করা বেতনের জন্য, যাতে আল্লাহর কোন সম্ভবিত্বের উদ্দেশ্য থাকে না। এই প্রকারের আমল বাতিল, হারাম, বড় গুনাহ এবং ছোট শিরক। [দেখুন, তাসহীলুল আক্বীদা, ড.জিবরীন, পৃঃ৩৭৬]

আল্লাহ বলেন:

“যারা এ দুনিয়ার জীবন আর তার শোভা সৌন্দর্য কামনা করে, তাদেরকে এখানে তাদের কন্মের পুরোপুরি ফল আমি দিয়ে দেই, আর তাতে তাদের প্রতি কোন কমতি করা হয় না। কিন্তু আখেরাতে তাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নাই। এখানে যা কিছু তারা করেছে তা নিষ্ফল হয়ে গেছে, আর তাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম ব্যর্থ হয়ে গেছে।” [হুদ, ১৫-১৬]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: “অবশ্যই আমল সমূহ নিস্তর করে নিয়তের উপরে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পায়, যার সে নিয়ত করে থাকে।” [বুখারী, নং ১, মুসলিম, নং ১৯০৭]

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন: “যে ইলম আল্লাহর সম্ভবিত্বের উদ্দেশ্যে অর্জন করা হয় কেউ যদি তা কেবল পার্থিব উদ্দেশ্যে তা করে তবে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না”। [আহমদ, ২/৩৩৮, আবু দাউদ, নং (৩৬৬৪) ইবনু হিব্বান নং (৭৮)]

উপরোক্ত দলীল-প্রমাণের আলোকে একথা সুস্পষ্ট যে, ইমামতির উদ্দেশ্য যদি শুধু বেতন হয় কিংবা শুধু কোন পার্থিব লাভ হয়, তাহলে সেই ইমামতি বাতিল ও হারাম। তাই আমাদের ঐসকল ইমামদের চিন্তা করা প্রয়োজন যারা বেতন ছাড়া ইমামতি করেন না বা বেতনের চুক্তি করেই ইমামতি করেন; নচেৎ করেন না।

২- মূলত: ইমাম যদি সওয়াবের আশায় ইমামতি করে অতঃপর সরকার তাকে বায়তুল মাল থেকে ভাতা প্রদান করে, কিংবা কোন সংস্থা তাকে ভাতা দেয় কিংবা কোন ব্যক্তি তাকে এ কারণে সাহায্য দেয়, তাহলে তা গ্রহণে কোন অসুবিধা নেই বরং তা জায়েজ। [ইসলামের শুরু যুগে যাকে বায়তুল মাল বলা হত, বর্তমান যুগে তা অর্থ মন্ত্রণালয় বলা যেতে পারে।] সউদী ইফতা বোর্ডকে ঐ ইমামের পিছনে নামায পড়া বৈধতা বা অবৈধতার বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, যে এর ফলে সরকারী মজুরি নেয়। উত্তরে বোর্ড তাদের পিছনে নামায পড়া বৈধ বলে ফাতওয়া দেন এবং সেই ইমামের বেতন গ্রহণকেও বৈধ বলেন। বোর্ডের উত্তরটি নিম্নে উল্লেখ করা হল:

ফাতওয়া নং (৩৫০২) সরকারি মজুরি পায় এমন ইমামের পিছনে নামায আদায় বৈধ কি?

উত্তর: ‘হ্যাঁ। এমন ব্যক্তির পিছনে নামায পড়া বৈধ। কারণ সে মুসলিমদের সাধারণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। তাই মুসলিমদের বায়তুল মালে তার অধিকার রয়েছে, যা থেকে তার মজুরি প্রদান করা

হবে। যেমন খুলাফা, আমীর, কাজী, শিক্ষক এবং এই রকম অন্যান্যদের তাদের দায়িত্ব পালন করার জন্য দেওয়া হয়। এই নিয়ম নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগ থেকে এখন পর্যন্ত চলে আসছে। অনুরূপ ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের তাদের দায়িত্ব পালনের কারণে আওকাফের পক্ষ থেকে দেওয়া শস্য গ্রহণও বৈধ।’

[সউদী স্থায়ী ফতোয়া কমিটি, ৭/৪১৭]

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ১০

ফিকাহ বিশ্বকোষে বর্ণিত হয়েছে, ‘এমন কাজে বায়তুল মাল থেকে অনুদান নেওয়া বৈধ, যার মাধ্যমে সকল মুসলিম উপকৃত হয়, যেমন বিচার বিভাগ, ফাতওয়া বিভাগ, আযান, ইমামত, কুরআন শিক্ষা এবং হাদীস ফিকাহ এর মত উপকারী বিদ্যা শিক্ষা ইত্যাদি। কারণ এ গুলো সাধারণ জনকল্যাণের অঙ্গভূক্ত’। [মাওসুআ ফিকহিয়াহ, ২২/২০২]

পূর্বসূরি উলামাগণ বায়তুল মালের অনুদানকে ‘বিনিময়’ (ইওয়ায) কিংবা ‘মজুরী’ (উজরাহ) বলেন নি বরং তাঁরা এটাকে ‘রাযক’ অর্থাৎ জীবিকা বা দান বলেছেন।

ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন: ‘আর যা বায়তুল মাল থেকে নেওয়া হয়, তা বিনিময় ও মজুরি নয়; বরং তা আনুগত্যের কাজে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে অনুদান। আর সং কাজে অনুদান গ্রহণ কাজটিকে নৈকট্য থেকে বের করে না আর না ইখলাসে ব্যাঘাত ঘটায়; ব্যাঘাত ঘটলে গনিমতের হকদার হত না’। [প্রাণ্ডুজ, ২২/২০২]

৩- বায়তুল মাল বা সরকারি ব্যবস্থাপনার অবর্তমানে যদি কোন সংস্থা বা মসজিদ কমিটি ইমামদের মাসিক সাহায্য বা অনুদান দেয়, তাহলে তা বায়তুল মালেরই ঈলাভিষিক্ত হিসাবে গণ্য হবে।

৪- ইমাম যদি অর্থশালী হয় তবে ইমামতির জন্য বেতন-ভাতা না নেওয়াই উত্তম। কিন্তু ইমাম যদি অভাবী হয় এবং ইমামতীর দায়িত্ব পালনের কারণে নিজস্ব প্রয়োজন ও তার সংসারের প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দিতে অক্ষম হয় তবে তার জন্য এতখানি মাসিক বেতন বা সাহায্য নেওয়া বৈধ, যার মাধ্যমে তার ও তার সাংসারিক অভাব পূরণ হয়। আল্লাহ তাআলা ইয়াতীমের অভিভাবকদের আদেশ করেন:

“আর যে অভাব মুক্ত সে যেন বিরত থাকে আর যে অভাবগ্রস্ত সে যেন ন্যায্যসঙ্গত ভাবে ভোগ করে।” [আন নিসা/৬]

তাই অনেকে অভাবী ইমামদের সাহায্য নেওয়াকে এই আদেশের উপর কৈয়াস করত: বৈধ বলেছেন। তাছাড়া অভাবীর অভাব দূরীকরণ ইসলামের একটি সুন্দর মৌলিক বিধান।

উল্লেখ্য যে, ইমাম, মুয়াজ্জিন, দ্বীনের দাঈ এবং মজবের শিক্ষক যারা তাদের সময়ের অধিকাংশ এই রকম দ্বীনই কাজে ব্যয় করে থাকেন তাদের বেতন-ভাতার ব্যবস্থা সরকারকে বায়তুল মাল থেকে করা উচিত। সরকারি ব্যবস্থা না থাকলে ইসলামী সংস্থাগুলো করা প্রয়োজন। যদি এমন সংস্থাও না থাকে তাহলে এসব কাজের কমিটি এমনকি ব্যক্তি বিশেষকেও করা দরকার। কারণ উপরোক্ত সং কাজ সমূহ দ্বীনের ও মুসলিম সমাজের মৌলিক ও সাধারণ জনকল্যাণের কাজ, যা শূণ্য হয়ে গেলে বা হ্রাস পেলে ইসলাম ও মুসলিম সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হবে।

৫- কোন অমুসলিম সরকার যদি ইমাম ভাতার ব্যবস্থা করে এবং এর বিনিময়ে সরকার যদি তাদের উপর কোন অবৈধ কাজের শর্তারোপ না করে, তাহলে সাধারণত: সেই ভাতা গ্রহণ বৈধ হবে। কারণ লেনদেনের মূলনীতি হচ্ছে, বৈধতা। তাছাড়া মজুরি গ্রহণের ক্ষেত্রে মজুরিদাতার মুসলিম হওয়া শর্ত নয়। [ওয়াল্লাহু আলাই]

ইমামতি ছাড়া ইমামের কিছু পছন্দনীয় কাজ:

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, একজন ইমামের মূল দায়িত্ব হচ্ছে ইমামতি করা। সে একজন আমানতদার হিসাবে নিষ্ঠার সাথে তার দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু যেহেতু সে মুসাল্লীদের দৃষ্টিতে আদর্শ, সেহেতু তাকে এই দায়িত্বকে গনিমত ভেবে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা দরকার

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ১১

এবং তাকে এমন কিছু দ্বীনী ও সামাজিক কাজ আঞ্জাম দেওয়া প্রয়োজন, যার মাধ্যমে সেই মসজিদের মুসল্লীবর্গ সহ সেই গ্রাম ও মহল্লার লোকেরা যেন সঠিক দ্বীন জানতে পারে, ইসলামি আদর্শে আদর্শবান হতে পারে এবং সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে পারে।

সম্মানিত ইমামগণের উদ্দেশ্যে নিম্নে কিছু ভাল কাজের সূচী প্রদত্ত হল:

১- মুসল্লীদের সংখ্যা ও উপযুক্ত সময়ের দিকে খেয়াল রেখে দৈনন্দিন কোন নামায শেষে সংক্ষিপ্ত ৮-১০ মিনিট বিভিন্ন আলোচনার ব্যবস্থা করা। এই ক্ষেত্রে সুন্দর নিয়ম হল, কোন যোগ্য আলোমের বই ধারাবাহিক ভাবে পাঠ করা। আক্বীদা, পাক-পবিত্রতা, নামাযের নিয়ম-পদ্ধতি, ইসলামি শিষ্টাচার, হালাল-হারাম ও এই ধরনের বিষয়াদিকে প্রাধান্য দেওয়া দরকার।

২- মৌসুম অনুযায়ী বিষয় পরিবর্তন করা এবং সে হিসাবে আলোচনা করা। যেমন রামাযান মাসে রোযার বিভিন্ন মাসায়েল, কুরবানী ও হজ্জের সময় সে সব মাসায়েল, ফসলাদি কাটার সময় উশর-যাকাতের মাসায়েল। বর্তমান সউদী আরবের বেশীর ভাগ মসজিদে এই নিয়ম লক্ষ্য করা যায়।

৩- মক্তব-মাদাসার ব্যবস্থা থাক কিংবা না থাক, কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে শিশুদের সাথে সাথে বড়দের জন্যও আলাদা ভাবে ব্যবস্থা করা।

৪- মসজিদে মহিলাদের নামায পড়ার ব্যবস্থা না থাকলে, ব্যবস্থা করতে মুসল্লীদের উদ্বুদ্ধ করা।

৪- পর্দার ব্যবস্থা করে মহিলাদের জন্য মাসিক বা পাক্ষিক দ্বীন শিক্ষা ও দাওয়াতের ব্যবস্থা করা।

৫- মাঝে মাঝে মসজিদে সকাল সন্ধ্যা ও নামায শেষে পঠনীয় দুয়া ও যিকির শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৬- নিজের সম্মান বজায় রেখে অন্যের পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসায় অংশ নেওয়া।

৭- ধীরে ধীরে মসজিদ লাইব্রেরী গঠন করা। মসজিদ লাইব্রেরী বলতে সেই গ্রন্থ সমাহারকে বুঝায় যা ইসলামের মৌলিক গ্রন্থ হিসাবে পরিচিত এবং যা মসজিদে পঠন-পাঠনের জন্যই নির্দিষ্ট। যেমন কুরআন, কুরআনের তাফসীর, বুখারী মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ এবং কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ফিকাহ গ্রন্থ। এর মাধ্যমে যেমন ইমাম স্বয়ং উপকৃত হয়, তেমন মুসালাংটারাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বচক্ষে দলীল-প্রমাণ দেখতে পায়।

৮- আগ্রহ ও ইখলাসের সহিত অসুস্থ মুসল্লীদের যিয়ারত করা এবং তাদের জানাযায় শরীক হওয়া; কারণ এটা যেমন নেকীর কাজ, তেমন এক মুসলিম ভাইর প্রতি অপর মুসলিম ভায়ের অধিকার ও ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির বিরাট বড় উপায়।

৯- মাঝে মাঝে ভাল আলোমকে নিয়ে এসে বিশেষ আলোচনার ব্যবস্থা করা।

১০- মাঝে মাঝে মসজিদের আয়োজনে ও তত্ত্বাবধানে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

যে সব কাজ থেকে ইমামকে বিরত থাকা উচিত:

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ১২

যেহেতু ইমামতি একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনই পদ, সেহেতু ইমামকে যেমন এই কাজের যোগ্য হতে হবে, তেমন তাকে আরো কিছু মহৎ গুণের অধিকারী হওয়া উচিত যেমন, সত্যতা, সত্যবাদিতা, চরিত্রবান এবং এই ধরনের অন্যান্য ভাল গুণ। এই সব আনুষঙ্গিক গুণ থাকলে তার কথার ও আদেশ-উপদেশের সমাজে সহজে প্রভাব পড়বে এবং তা গ্রহণীয় হবে। কিন্তু কারো মধ্যে উপরে বর্ণিত ইমামতির হকদারের গুণগুলি থাকলেও যদি এই আনুষঙ্গিক গুণগুলি না থাকে, তাহলে সেই ইমাম সাধারণত: তার সমাজে কামিয়াব ইমাম বিবেচিত হয় না। তাই প্রত্যেক ইমামকে তার সমাজে প্রচলিত কিছু এমন কাজ-কর্ম ও অভ্যাস থেকে বিরত থাকা উচিত, যা করলে স্বয়ং সে দ্বীনের দিক থেকে লাভবান হতে পারবে, তার কথা ও কাজ অধিক গৃহীত হবে এবং সে আত্মমর্যাদার জীবন-যাপন করবে। ইনশাআল্লাহ।

১- গণতান্ত্রিক দেশে সাধারণত: কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত না থাকা। কারণ তিজ হলেও সত্য যে, আমাদের সমাজের অধিকাংশ লোক কোন না কোন ভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত কিংবা প্রভাবিত। যার ফলে তারা ইসলামের দৃষ্টিতে নয়; বরং রাজনীতির নীতিতে একে অপরকে ভাল-মন্দ বিবেচনা করে থাকে। তাই ইমাম কোন দলের সাথে সম্পৃক্ত হলে প্রথমেই সে মুসল্লীদের একটি বড় অংশের অশুভ থেকে বাদ পড়ে যাবে এবং তার মূল উদ্দেশ্য বিফল হয়ে যাবে। অতঃপর তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হবে। পরিশেষে হয়ত: ইমামতি হারাতে হবে, বৈজ্ঞানিক হতে হবে, সমাজ ভেঙ্গে যাবে আর অনেক সময় মসজিদ ভেঙ্গে আরো একটি মসজিদ নির্মাণ হবে, যা খুবই দুঃখজনক ও নিন্দনীয়।

২- আত্মমর্যাদার সবসময় খেয়াল রাখা। নিজের অভাব-অনটন ও মুখাপেক্ষিতা সবার কাছে পেশ না করা তার হাবভাবে প্রকাশ না করা। কারণ এর ফলে ইমাম তার মুসালাফীদের ও গ্রামবাসীদের নজরে ছোট হয়ে যায়, মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। ফলস্বরূপ তার আদেশ-উপদেশও তাদের কাছে হাক্ষা হয়ে যায়। অনেক সময় লোক তাকে মর্যাদা দেয়া তো দূরের কথা তাকে দেখলেই উপহাসের ছলে কথা বলে।

৩- কুরআন ও দ্বীনই শিক্ষার দায়িত্ব থাকলে ছেলে ও মেয়েদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পড়ার ব্যবস্থা করা। সম্ভব না হলে ছেলেদের সাথে শুধু নাবালিকা মেয়েদের পড়ার দায়িত্ব ভার নেওয়া। কারণ এটা যেমন দ্বীনই বিধান তেমন অনেক শয়তানী চক্রান্ত ও বদনাম থেকে বাঁচার উপায়।

৪- কেবল প্রয়োজনে বৈধ ঝাড়-ফুক করা। কিন্তু এটাকে নিজের পেশা বা স্বভাবে পরিণত না করা। কারণ একাজ সাধারণত: বৈধ দিয়ে শুরু হয় এবং পরে বিভিন্ন কারণে হারামে পরিণত হয়। (যেমন, তাবিজ ব্যবসা)

৫- মহল্লা বা গ্রামের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে দাওয়াত পাওয়া ছাড়া অংশ না নেওয়া এবং এ বিষয়ে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য না করা। এসব অনুষ্ঠানের ফলে কিছু পাওয়ার লোভ না করা আর না কিছু চুক্তি করা। তবে না চাইতে কেউ কিছু দান করলে তা গ্রহণ করা অবৈধ নয়।

৬- বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্বন্ধে শারিয়ার বিধান স্পষ্ট করে বলে দেওয়া এবং নিজের জন্য এ সম্পর্কে সেই বিধান অনুযায়ী একটি সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা, যেন আপনার কোথাও অংশ নেওয়া বা না নেওয়া সেই শারঈ কারণে হয়। যার ফলে আপনি বলতে সক্ষম হবেন যে, আপনি কোন অনুষ্ঠানে কেন যান আর অন্য অনুষ্ঠানে কেন উপস্থিত হন না।

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ১৩

১-যার অবস্থা অজ্ঞাত, এমন ইমামের পিছনে নামাযঃ

কোথাও অপরিচিত ইমামের পিছনে নামায আদায় করার সময় মুসাললটিকে ইমামের দ্বীনী অবস্থা সম্পর্কে জানা বা খোঁজ নেওয়া জরুরী নয়; বরং তার বাহ্যিক অবস্থাই গ্রহণীয়। আবুল ইয়় শারহ্ আক্বীদাতিত্ ত্বাহাবিয়ায় বলেনঃ ‘মুক্তাদীর জন্য ইমামের আক্বীদা জানা শর্ত নয় আর না তাকে পরীক্ষা করবে এই বলে যে, তোমার আক্বীদা কি? বরং সে অবস্থা অজ্ঞাত এমন ইমামের পিছনে নামায আদায় করবে’।

[শারহুল্ আক্বীদা আত্ ত্বাহাবিয়াহ, ২/৫৬৮]

সউদী স্থায়ী উলামা পরিষদকে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে ব্যক্তি কোন শহরে বা গ্রামে অবস্থান করে, তার উপর জরুরী কি যে, সে নামায আদায়ের

পূর্বে তার ইমামের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে?

উত্তরে পরিষদ বলেনঃ ‘তার উপর এটা জরুরী নয় এবং অজ্ঞাত ইমামের পিছনে তার নামায পড়া বৈধ কিন্তু যদি তার মধ্যে এমন কিছু দেখে যা দ্বীনে মন্দ। কারণ মুসলিমের অবস্থা সম্পর্কে নীতি হল, তাদের সম্পর্কে সুধারণা রাখা, যতক্ষণে এর বিপরীত প্রকাশ না পায়’। [ফাতাওয়াল্ লাজনা, ৭/৩৬৩]

২-শির্ককারী ইমামের পিছনে নামাযঃ

মুসলিম হিসাবে পরিচিত কিন্তু সে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট দুআ-প্রার্থনা করে, নবী, অলী ও সৎ লোকদের আল্লাহর নৈকট্যকারী মনে করে, মৃত কথিত অলীদের উদ্দেশ্যে কুরবানী করে, মানত করে, কবরস্থ সৎ দরগাহ বাসীকে কল্যাণকারী বা ক্ষতি সাধনকারী বিশ্বাস করে, এমন ইমামের পিছনে নামায বৈধ কি?

এ বিষয়ে উপরোক্ত সউদী ফাতাওয়া বোর্ডকে জিজ্ঞাসা করা হলে, তারা তার পিছনে নামায অবৈধ বলেছেন। কারণ এসব ইবাদত বা এর কোন অংশ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য করা শির্ক, যা মানুষকে ইসলামের গোষ্ঠী থেকে বের করে দেয়।

[দেখুন, ফাতাওয়াল্ লাজনা আদায়িমাহ, ৭/৩৫৩-৩৫৯, বিষয়ঃ মুশরিকের পিছনে নামায]

৩-ফাসেক এবং বিদআতী ইমামের পিছনে নামাযঃ

[ফাসেক, বড় গুনাহকারী বা বারংবার ছোট গুনাহকারী ব্যক্তি। আর এখানে বিদআতী বলতে ঐ বিদআতকে বুঝানো হয়েছে যা, কুফর নয়।]

ক-উপরোক্ত মন্দ গুণের অধিকারী ইমামের পিছনে নামায সহীহ। বিশেষ করে সেই ইমাম যদি রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নির্ধারিত হয় এবং তাকে অপসারণ করার ক্ষমতা না থাকে কিংবা তাকে সরাসরি গিয়ে যদি ফেতনা-ফাসাদের আশংকা থাকে, তাহলে তার পিছনে নামায শুদ্ধ। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল্ জামাআতের একটি আক্বীদাও।

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ১৪

ইমাম ত্বাহাবী বলেনঃ ‘আমরা আহলে কিবলার প্রত্যেক পরহেযগার এবং গুনাহগার ব্যক্তির পিছনে নামায জায়েয মনে করি’। [শারহুল আক্বীদা আত্ ত্বাহাবিয়া, ২/৫৬৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ “লোকদের ইমামতি করবে, তাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অধিক পাঠকারী”। [মুসলিম, নং (৬৭৩)]

এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ আম/ব্যাপক।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক প্রকার ইমামের সম্পর্কে বলেনঃ “তারা (ইমামেরা) তোমাদের নামায পড়াবে, যদি তারা সঠিক করে, তাহলে তোমাদের নামাযের সওয়াব তোমাদের জন্যে আর যদি সে ভুল করে তাহলে তোমাদের সওয়াব তোমাদের জন্যে এবং তাদের ভুল তাদের জন্যে” [বুখারী, আযান অধ্যায়, নং ৬৯৪]

সাহাবাগণের মধ্যে ইবনে উমার যিনি সুন্নতের প্রতি সদা আগ্রহী হিসাবে পরিচিত, তিনি অত্যাচারী গভন্দর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পিছনে নামায সম্পাদন করতেন। [বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, নং ১৬৬০]

ইমাম আহমদ সহ তাঁর যুগের উলামাগণ মুতামিলীর পিছনে জুমআ ও ঈদের নামাযে হাজির হতেন। [মুগনী, ইবনু কুদামাহ, ৩/২২]

সউদী স্থায়ী উলামা পরীষদের ফাতওয়ায় বিদআতী ইমামের পিছনে নামায সম্পর্কে বলা হয়, যদি বিদআত কুফর ও শির্ক পর্যায়ে হয়, তাহলে তার পিছনে নামায অশুদ্ধ আর বিদআতকারীর বিদআত যদি কুফরী পর্যায়ে না হয়, যেমন মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত পড়া, তাহলে তার নিজের নামায শুদ্ধ এবং তার পিছনে নামায আদায়কারীর নামাযও শুদ্ধ। [ফাতওয়া নং (১২০৮৭), ৭/৩৬৪-৩৬৫]

এ বিষয়ে একটি মূলনীতি হচ্ছে, ‘যার নিজের নামায শুদ্ধ তার ইমামতীও শুদ্ধ’। [আশ্ শারহুল মুমতি, ইবনে উসাইমীন, ৪/২১৭]

এসব বিধান ও নিয়মের মূল কারণ হচ্ছে, ইসলামী ঐক্য ও সংহতি রক্ষা। ইসলাম সদা ঐক্যের আদেশ দেয় এবং মতভেদ থেকে সতর্ক করে। তাই দেখা যায়, যেখানে মানুষ ইমামদের সাধারণ ভুল-ত্রুটি নিয়ে মতভেদ করে, সেখানে লোকেরা দলে দলে বিভক্ত হয়, এক পর্যায়ে একাধিক মসজিদ তৈরি হয়, এমনকি গ্রাম ও মহল্লা ভেঙ্গে আপসে ঘোর শত্রুতায় লিপ্ত হয়।

কিন্তু বিদআতী ও ফাসেক ইমামের বর্তমানে যদি মুআহিহদ ও মুত্তাকী ইমামের পিছনে নামায পড়া সম্ভব হয়, তাহলে পরহেযগার ও সহীহ আক্বীদা পোষণকারী ইমামের পিছনে নামায পড়া উত্তম। কারণ, অবশ্যই ফাসেক থেকে মুত্তাকী উত্তম এবং বিদআত থেকে সুন্নত উত্তম। আল্লাহ বলেনঃ “তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই বেশী সম্মানীয় যে ব্যক্তি বেশী মুত্তাকী।” [সূরা হুজুরাত/১৩]

উদাহরণ স্বরূপ যদি কারো বাড়ির পার্শ্বে দুটি মসজিদ থাকে, একটির ইমাম সুন্নাহ ও তাকুওয়ার অধিকারী আর অপরটির ইমাম বিদআত ও ফিসকে লিপ্ত, তাহলে সে প্রথমটির পিছনে নামায আদায় করবে; যদিও সেই মসজিদটি দূরে অবস্থিত হয়।

৪-নাবালেগের ইমামতীঃ

বালেগ এর বিপরীত নাবালেগ। শরীয়ার দৃষ্টিতে নিম্নের তিনটি বিষয়ের যে কোন একটির প্রকাশ পাওয়া বালেগ হওয়া বুঝায়।

১-পনের বছর বয়স পূরণ হওয়া।

২-গুপ্তাঙ্গের চতুর্পার্শ্বে লোম উদগত হওয়া।

৩-যৌন চেতনার সাথে জগত বা নিদ্রাবস্থায় বীর্যপাত হওয়া।

আর মহিলাদের ক্ষেত্রে আর একটি বিষয় যোগ হবে, তা হচ্ছে মাসিক স্রাব আসা। মাসিক স্রাব প্রকাশ মহিলাদের বালেগা হওয়ার আলামত। [শারহুল মুমতি, ইবনে উসায়মীন, ৪/২২৪]

ছয়-সাত বছরের নাবালেগ ছেলে যদি নামাযীদের মধ্যে অধিক কুরআন মুখস্থকারী হয়, তাহলে তার ইমামতি সিদ্ধ। আমার বিন সালামাহ বলেনঃ আমাকে তারা (গোত্রের সাহাবারা) ইমাম বানিয়ে দেয়। সেই সময় আমার বয়স ছয় কিংবা সাত বছর ছিল। কারণ তারা নিজেদের মাঝে খোঁজে দেখে যে, আমারই সর্বাধিক কুরআন মুখস্থ রয়েছে।

[বুখারী, অধ্যায়, মাগাযী, অনুচ্ছেদ নং ৫৩, হাদীস নং ৪৩০২]

৫-অন্ধ ব্যক্তি ও দাসের ইমামতিঃ

অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি নিঃসন্দেহে বৈধ। আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে মাকতূমের পুত্রকে মদীনায় দুইবার স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। তিনি তাদের ইমামতি করতেন এবং তিনি অন্ধ ছিলেন। [আবু দাউদ, সালাত অধ্যায়, নং ৫৯৫/আহমাদ, ৩/১৯২]

ইবনে উমার থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূর্বে মদীনার কুবর নিকট হিজরতকারীদের আবু হুযায়ফার (রাযিঃ) দাস সালেম ইমামতি করতেন কারণ তিনি বেশী কুরআন মুখস্থকারী ছিলেন। [বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, নং ৬৯২]

ইমাম বুখারী উক্ত হাদীসের অনুচ্ছেদ যেই শিরোনামে রচনা করেন, তা হলঃ ‘দাস ও স্বাধীনকৃত দাসের ইমামতি’।

আয়েশা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর জনৈক দাস তাঁর ইমামতি করতো।

[মুগনী, ৩/২৬]

৬-বোবা ও বধির ব্যক্তির ইমামতিঃ

বোবা ব্যক্তি, সে জন্মগত বোবা হোক কিংবা পরে কোন কারণে বোবা হোক, তার ইমামতি জায়েয নয়; কারণ সে নামাযের রুকন ও ওয়াজিব উচ্চারণ করতে অক্ষম। যেমন তকবীরে তাহরীমা বলা, সূরা ফাতিহা পাঠ করা, তাশাহুদ পাঠ করা ইত্যাদি। তবে তার নিজের নামায সহীহ। [মুগনী, ৩/২৯, শারহুল মুমতি, ৪/২২৬-২২৭]

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ১৬

বধির ব্যক্তির ইমামতির সম্পর্কে কিছু উলামা বলেনঃ যেহেতু তার মাধ্যমে নামাযের কাজ ও শর্ত সমূহের ব্যাঘাত ঘটে না, তাই তার অবস্থা অন্ধ ব্যক্তির ন্যায়। আর যেমন অন্ধের ইমামতি জায়েয তেমন তারও জায়েয। কিন্তু কিছু উলামা এই বলে বধির ব্যক্তির ইমামতি অশুদ্ধ বলেছেন যে, যেহেতু সে ভুল করলে তাকে সুবহানালগাহ বলে ভুলের সংকেত দেওয়া অনর্থক, তাই তার ইমামতি সিদ্ধ নয়। [মুগনী, ৩/২৯]

মূলতঃ বোবা ও বধির ব্যক্তির ইমামতি সম্পর্কে স্পষ্ট কোন দলীল বর্ণিত হয় নি, তাই উলামাগণের মধ্যে এই মতভেদ।

৭-মহিলার ইমামতিঃ

মহিলার জন্য মহিলার ইমামতি বৈধ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মু অরাকা (রাযিঃ) কে আদেশ করেন, তিনি যেন তার বাড়ির সদস্যদের ইমামতি করেন। [আবু দাউদ, সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মহিলার ইমামতি, নং ৫৯১, ইবনু খুযায়মা বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন]

আয়েশা (রাযিঃ) হতে প্রমাণিত, তিনি মহিলাদের ইমামতি করতেন এবং লাইনের মাঝে দাঁড়াতেন। [মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, নং ৫০৭৬, দারাকুতুনী/বায়হাক্বী]

তবে তারা ইমামতির সময় পুরুষের মত লাইন থেকে আগে বেড়ে পৃথক স্থানে দাঁড়াবে না; বরং লাইনের মাঝেই অবস্থান করতঃ ইমামতি করবে। এটা কিছু সাহাবিয়ার আমল দ্বারা প্রমাণিত। [আর রাওদা আন নাদিয়াহ, সিদ্দীক হাসান খান, ১/৩২২]

কিন্তু মহিলার জন্য বৈধ নয় যে, তারা পুরুষের ইমামতি করবে। [প্রাগুক্ত, ৩১২-৩১৩] এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল, খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল এবং ধারাবাহিক মুসলিম উম্মার আমলই বড় প্রমাণ, যে তাঁরা কেউ মহিলাকে পুরুষের ইমাম নিযুক্ত করেন নি আর না তাদের যুগে এমন কোন নজীর ছিল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ “ঐ সম্প্রদায় কখনো সফলকাম হতে পারে না, যারা কোন মহিলাকে তাদের বিষয়াদির নেতা নিযুক্ত করে”। [বুখারী, অধ্যায়ঃ মাগাযী, নং ৪৪২৫] যেহেতু ইমামতি এক প্রকারের নেতৃত্ব, তাই তাদের এ পদে নিযুক্ত করা অবৈধ।

[দেখুন শারহুল মুমতি, ৪/২২২]

৮-রুকু, সাজদা, কিয়াম, কুউদ করতে অপারগ ব্যক্তির ইমামতিঃ

সাধারণতঃ রুকু, সাজদা, কিয়াম, কুউদ সহ নামাযের অন্যান্য রুকন পালন করতে অক্ষম ব্যক্তি এ সব পালনে সক্ষম ব্যক্তির ইমামতি করতে পারে না। কারণ এ ক্ষেত্রে ইমামের অবস্থা মুক্তাদী অপেক্ষা দুর্বল, যা ইমামের জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। তবে মসজিদের নির্ধারিত সবল ইমাম যদি কোন কারণে নামায পড়ানোর সময় কিয়াম করতে (দাঁড়াতে) অক্ষম হয়ে পড়ে কিংবা অসুস্থতার কারণে শুরু থেকেই দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম হয়, তাহলে সেই ইমাম বসে নামায পড়াতে পারেন। কিন্তু এই সময় দাঁড়াতে সক্ষম মুক্তাদীগণ বসে নামায পড়বে না দাঁড়িয়ে? এ বিষয়ে উত্তম মত হল, ইমাম যদি প্রথমে দাঁড়ানো অবস্থায় নামায শুরু করে

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ১৭

থাকেন আর মাঝে বসে পড়ান, তাহলে মুক্তাদীগণ দাঁড়িয়ে নামায সম্পাদন করবেন। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থকালে আবু বকর (রাযিঃ) দাঁড়িয়ে নামায শুরু করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাম পার্শে বসে ইমামতি করেন আর আবু বকর সহ অন্যান্য সাহাবাগণ দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে থাকেন। কারণ এখানে প্রথমে আবু বকর (রাযিঃ) দাঁড়িয়ে ইমামতি শুরু করেছিলেন। আর যদি ইমাম শুরু থেকেই বসে নামায পড়ান, তাহলে মুক্তাদীরাও বসে নামায পড়বেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ “যখন ইমাম বসে নামায পড়াবে তখন তোমরাও বসে নামায পড়বে”। [বুখারী, আযান অধ্যায়ঃ নং৬৮৯/ মুসলিম, সালাত অধ্যায়, নং৪১১/ বিস্ফুরিত দেখুন, শারহুল মুমতি, ৪/২২৮-২৩৬]

৯-উম্মী তথা অজ্ঞ ব্যক্তির পিছনে নামাযঃ

এখানে উম্মী বা অজ্ঞ বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে সূরা ফাতেহা ভাল করে পড়তে পারে না; যদিও সে অন্য সূরা ভাল করে পড়তে সক্ষম হয়। যেমন ‘রা’ কে ‘লা’ পড়ে কিংবা হরকত ভুল পড়ে যেমন, যেরের স্থানে যবার পড়ে বা যবারের স্থানে যের বা পেশ পড়ে, যার ফলে শব্দের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ (ইহ দিনা) অর্থ আমাদের সঠিক পথ দেখাও এর স্থানে পড়ে (আহ দিনা) অর্থ আমাদের হাদিয়া-উপহার দাও কিংবা (আন্ আম্ তা) অর্থ তুমি অনুগ্রহ করেছো এর স্থানে পড়ে (আন্ আম্ তু) অর্থ আমি অনুগ্রহ করেছি। তাহলে এমন উম্মী ইমামের পিছনে শুদ্ধ সূরা ফাতেহা পাঠকারীর নামায বৈধ নয়। তবে উপস্থিত সকল লোক যদি সূরা ফাতেহা অশুদ্ধ পাঠকারী হয়, তাহলে তাদের একে অপরের ইমামতি বৈধ। কারণ আল্লাহ তাআলা সাধ্যের অতিরিক্ত জরুরী করেন না। কিছু উলামার মতে সূরা ফাতেহা অশুদ্ধ পাঠকারীর পিছনে শুদ্ধ সূরা পাঠকারীর নামায বৈধ কিন্তু এটা উচিৎ নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ “লোকদের ইমামতি করবে তাদের মধ্যে আল্লাহরকিতাব অধিক পাঠকারী”। [মুসলিম, অধ্যায়ঃ মাসাজিদ, নং ৬৭৩ এবং ২৯০, আরো দেখুন, আল মুগনী, ৩/২৯-৩০, শারহুল মুমতি, ৪/২৪৫-২৪৯, ফতাওয়ালা লাজনা, ৭/৩৪৮]

১০-কিছু আনুসঙ্গিক বিষয়ঃ

ক-ইমামতির জন্য বিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। [সউদী স্থায়ী ফাতাওয়া পরিষদ, ৭/৩৮২]

খ-ব্যভিচারীর সম্প্রদানের ইমামতি অন্য মানুষের ন্যায়। তার মায়ের পাপের কারণে তার ইমামতি প্রভাবিত হবে না। [প্রাগুক্ত ফাতাওয়া পরিষদ, ৭/৩৮৮]

গ-ইমামতির সময় অযু নষ্ট হলে অন্য কোন মুক্তাদীকে ইমাম নিযুক্ত করা বৈধ। [প্রাগুক্ত, ৭/৩৯৫]

নামাযের পূর্বে ইমামের করণীয়ঃ

১-আযানের পর কিছুক্ষণ বিরতি প্রদানঃ

আযানের পর এবং নামায শুরু করার পূর্বে ইমাম কতক্ষণ বিরতি দিবেন বা অপেক্ষা করবেন, তার কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা সহী হাদীস দ্বারা বর্ণিত নয়। তবে বিভিন্ন হাদীসের আলোকে

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ১৮

কিছুক্ষণ বিরতি দেওয়া প্রমাণিত। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “প্রত্যেক দুই আযানের মাঝে নামায রয়েছে”। [বুখারী, নং ৫৮৮] অর্থাৎ আযান ও ইকামতের মাঝে নফল নামায আছে। এমনকি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাগরিবের ফরয নামাযের পূর্বেও নামায পড়ার আদেশ দেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “তোমরা মাগরিবের পূর্বে নামায পড়, তোমরা মাগরিবের পূর্বে নামায পড়, তৃতীয়বারে বলেনঃ যার ইচ্ছা।” [বুখারী নং ১১৮৩]

তাছাড়া আযানের উদ্দেশ্যই হল, লোকদের সংবাদ দেওয়া যে নামাযের সময় হয়ে গেছে, যাতে করে তারা অযু করে নামাযের প্রস্তুতি নিয়ে মসজিদে উপস্থিত হয়। তাই আযানের পর সময় না দিলে এই মূল উদ্দেশ্যই নষ্ট নয়।

ইশার নামায সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি মসজিদে লোকদের অধিক হারে উপস্থিতি দেখতেন, তাহলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটু আগেই নামায শুরু করতেন আর যদি সংখ্যা কম দেখতেন তো একটু বিলম্ব করতেন। [বুখারী, নং ৫৬৫]

উপরোক্ত তথ্যানুসারে এটা স্পষ্ট যে, আযান ও ইকামতের মাঝে কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করা প্রমাণিত ও মুস্তাহাব। তবে নির্দিষ্টরূপে এর সময়সীমা কতখানি হবে তা বর্ণিত নয়। তাই বিভিন্ন নামাযের পূর্বে সুন্নতে রাতেবার দিকে লক্ষ্য রেখে, নামাযীদের দূর কিংবা নিকটে অবস্থানের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং আরো অন্যান্য বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে ইমাম সময়সীমা নির্ধারণ করতে পারেন। অনুরূপ ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের সম্মতিতে যদি কোন সময় সূচী নির্ধারণ করা হয়, কিংবা সরকার বা মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে সময়সূচী নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, যা সকলকে এক সাথে জামাআতের সাথে নামায আদায় করতে সহায়ক, তাহলে এই রকম করা অনুচিত নয়। তবে তাদের অবশ্যই খেয়াল রাখা দরকার যে, বিরতি যেন এত দীর্ঘ না হয় যাতে আউয়াল ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আশংকা থাকে কিংবা এত কম না হয় যাতে লোকদের মসজিদে আসা ও সুন্নত পড়া বাধাগ্রস্ত হয়।

২-সুতরা না থাকলে সুতরা করে নেওয়াঃ

সুতরা উঁচু বিশিষ্ট এমন বস্তুকে বলে যা নামাযী তার সাজদার স্থানের সম্মুখে রাখে, যেন কেউ তার ভিতর দিয়ে অতিক্রম না করে এবং এর বাইরে যা কিছু ঘটে সেই দিকে নামাযীর ধ্যান না যায়।

দেয়াল, প্রাচীর, বেড়া, খুঁটি, লাঠি, বর্শা, বল্লম, গাছ, পাথর, বাহন (গাড়ি-যোড়া) ইত্যাদি লম্বা কিংবা চওড়া বিশিষ্ট বস্তু সুতারার জন্য প্রযোজ্য। [মুগনী, ৩/৮০, আল্ মুলাখ্বাস আল্ ফিকহী, ৭২-৭৩]

ইমাম যখন তাঁর মিহরাবে (ইমাম দাঁড়ানোর স্থান) দেয়ালের নিকটে নামায পড়াবে তখন সেই দেয়াল তার সুতরা হিসেবে বিবেচিত হবে। তখন আর অন্য ভিন্ন সুতরা মেহরাবে রাখার প্রয়োজন নেই। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মিহরাবে সুতরা থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ইমাম যদি মসজিদের মাঝে নামায পড়ায় কিংবা ফাঁকা স্থানে নামায পড়ায় অর্থাৎ সামনের স্থান খালি থাকে, কারো অতিক্রম করার আশংকা থাক কিংবা না থাক, তাহলে সামনে সুতরা রাখা মুস্তাহাব। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

”مِنْهَا وَلِيَذُنَ سُرَّةً، إِلَى فُلَيْصَلْ، أَحَدَكُمْ صَلَّى إِذَا

“তোমাদের কেউ যখন নামায পড়বে, তখন যেন সে সুতরা সামনে করে নামায পড়ে এবং তার নিকটবর্তী হয়”। [আবু দাউদ, নং ৬৯৮, ইবনু মাজাহ নং ৯৫৪, ইবনু খুযায়মাহ নং ৮৪১, সূত্র হাসান]

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ১৯

উপরোক্ত বিধানটি ইমাম ও একাকী নামাযী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য তবে ইমাম সুতরা করলে আর মুক্তাদীদের সুতরা করার প্রয়োজন নেই, এটাই অধিকাংশ বিদ্বানের মত। [মুগনী, ৩/৮১] সুত্রার দৈর্ঘ্যতা এক বিঘত কিংবা এক গজ হওয়া এবং নামাযীর সাজদা ও সুত্রার মাঝে একটি ছাগল পার হওয়ার মত ফাঁকা থাকা প্রমাণিত। [মুসলিম, অধ্যায়, সালাত, অনুচ্ছেদ, মুসল্লীর সুতরা, নং ১১১২, ১১১৪, ১১৩৪/বুখারী নং ৪৯৪]

প্রকাশ থাকে যে, কিছু উলামা সুতরা করাকে ওয়াজিব বলেছেন, অনেকে সুন্নতে মুআক্কাদাও বলেছেন, তবে জমহূরে উলামা সুতরা করাকে মুশতাহাব বলেছেন। পারত পক্ষে এই বিধান পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

৩-লাইন সোজা করার আদেশ প্রদানঃ

নামাযে দাঁড়ানোর সময় লাইন সোজা করা, বরাবর হওয়া, লাইনের মাঝে জায়গা ফাঁকা না রাখা এবং প্রথম লাইন পূর্ণ করার পূর্বে দ্বিতীয় লাইন তৈরি না করা ওয়াজিব আমলের অঙ্গুর্ভুক্ত। এটি যেমন মুক্তাদীদের কর্তব্য তেমন ইমামেরও দায়িত্ব যে, সে নামায শুরু করার পূর্বে এর আদেশ করবে এবং যথাসম্ভব নিজে তা পর্যবেক্ষণ করবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায শুরু করার পূর্বে বলতেনঃ

و البخاري رواه "الصلاة تمام من الصف تسوية فإن صفوفكم سواء مسلم

“তোমরা তোমাদের লাইন সোজা করে নাও কারণ লাইন সোজা করা নামাযের পরিপূর্ণতার অঙ্গুর্ভুক্ত” [বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, নং ৭২৩/ মুসলিম, অধ্যায়ঃ স্বালাত, নং ৯৭৪]

আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তকবীরে তাহরীমা দেয়ার পূর্বে আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে এবং বলতেন তোমরা একে অপরের সাথে ঘেঁষে দাঁড়াও এবং সোজা হয়ে দাঁড়াও” [বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, নং ৭১৯/মুসলিম অধ্যায়ঃ নামায নং ৯৭৫]

৪-ইমামতির সময় ইমামের অবস্থানঃ

ক-ইমামতির সময় ইমাম মুক্তাদীদের তুলনায় উঁচু স্থানে অবস্থান করবে না। ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইমামের কোন কিছুর উপরে অবস্থান করা আর মুক্তাদীদের তার থেকে নিম্ন স্থানে অবস্থান করা থেকে নিষেধ করেছেন।” [দারী কুত্বনী, জানাযা অধ্যায়] তবে নামাযের নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে ইমামের উঁচু স্থানে ইমামতি করা বৈধ। [বুখারী, মাসাজিদ অধ্যায়ঃ নং ৯১৭]

খ-ইমামের সাথে যদি এক পুরুষ ব্যক্তি নামায পড়ে তাহলে সে ইমামের ডান দিকে দাঁড়াবে। যদি ভুল করে সে তার বাম পার্শ্বে দাঁড়ায়, তাহলে ইমাম তাকে তার ডান পার্শ্বে করে নিবে। আর ইমামের সাথে যদি দুই কিংবা দুইয়ের অধিক পুরুষ ব্যক্তি শুরু থেকে নামায পড়ার জন্য উপস্থিত থাকে, তাহলে ইমাম আগে বেড়ে নামায পড়াবে আর তারা পিছনে এক লাইনে দাঁড়াবে। যদি ইমামের সাথে এক ব্যক্তি নামায পড়তেছে এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ব্যক্তি শরীক হতে চায়, তাহলে মুক্তাদী দুজন পিছনে চলে আসবে আর ইমাম নিজ স্থানে থেকে ইমামতি করবে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি ইমামের বাম পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ইমাম তাদের দুই জনকে পিছনে করে দিবে। যদি ইমামের সাথে পুরুষ, মহিলা ও নাবালেগ বাচ্চা নামায পড়ে, তাহলে পুরুষেরা ইমামের পিছনে লাইন করবে অতঃপর পুরুষ বাচ্চার লাইন করবে

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ২০

অতঃপর মহিলারা। যদি ইমামের সাথে একজন পুরুষ ও এক বা একাধিক মহিলা নামায পড়তে চায়, তাহলে পুরুষ ব্যক্তি ইমামেন ডান পার্শ্বে দাঁড়াবে আর এক বা একাধিক মহিলা পিছনে আলাদা লাইনে দাঁড়াবে। [দেখুন নায়লুল আউত্‌হার, শাওকানী, অধ্যায়ঃ ইমাম ও মুক্তাদীদের অবস্থান..অনুচ্ছেদ নং ২১০, ৩/২২৬-২২৯]

গ-সকল নাবালেগ বাচ্চাদের এক লাইনে দাঁড় করালে যদি তাদের গোলমাল করার এবং বড়দের নামাযে বিঘ্ন ঘটানোর আশংকা থাকে, তাহলে বড়রা বাচ্চাদের মাঝে মাঝে নিয়ে নামায পড়তে পারে। [শারহুল মুমতি, ইবনু উসাইমীন, ৪/২৭৮]

৫-ইমাম মুসাফির হলে নামাযীদের বলে দেওয়া, যেন তারা নামায পূরণ করে নেনঃ

মুসাফির ইমামের পিছনে মুকীম নামায পড়লে, ইমামের সালামের পর নামায পূরণ করতে হবে। এই সময় মুসাফির ইমাম সালাম ফিরানোর পর বলবেঃ আপনারা নামায পূরণ করে নিন কারণ আমি মুসাফির। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের সময় মক্কাবাসীদের ইমামতকালে এইরূপ বলতেন। [আবু দাউদ, সফর অধ্যায়, নং (১২২৯) মুআত্তা, ২/২০৬] এই কথাটি নামাযের পূর্বেও বলা যেতে পারে। [মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসাঈল, ইবনে উসাইমীন/১৫/১৫৩]

নামাযরত অবস্থায় ইমামের করণীয়ঃ

১-নামাযের রুকন ও ওয়াজিব কাজসমূহ পূর্ণরূপে সম্পাদন করাঃ

নামায পড়ানোর সময় ইমামের সবচেয়ে বড় করণীয় হচ্ছে, নামাযের রুকনগুলি ও ওয়াজিবগুলি পূর্ণরূপে ধীর-স্থিরতার সাথে সম্পাদন করা কিয়াম, কুউদ, রুকু, সাজদা, রুকু থেকে উঠা, দুই সাজদার মাঝে বসা ইত্যাদি কাজগুলি এমন ভাবে সম্পাদন করা যেন একটি কাজ শেষ হওয়ার আগে অপরটি শুরু না করা হয়। যেমন রুকু থেকে উঠে ভালভাবে সোজা না হয়েই সাজদা করা। অনুরূপ এক সাজদা থেকে উঠে ভাল করে না বসেই দ্বিতীয় সাজদা করা। ফুকাহাগণ স্থিরতার সংজ্ঞায় বলেছেনঃ একটি কাজ করার সময় মানুষের অঙ্গের যেই নড়া-চড়ার প্রয়োজন হয় তা স্থির হওয়ার পর এতখানি স্থির থাকা যাতে ভালভাবে একবার তাসবীহ [সুবহানাল্লাহ] বলা সম্ভব হয়। উলামাগণের নিকট এই বিষয়টি ‘তা’দীলুল আরকান’ নামে পরিচিত, যা করা ওয়াজিব। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাড়াহুড়া করে নামায পাঠকারীকে পুনরায় নামায পড়ার আদেশ দেন। [বুখারী, নং ৭৯৩/ মুসলিম]

২-মুক্তাদীদের অবস্থার খেয়াল রাখাঃ

ইমামতির সময় ইমামকে খেয়াল রাখা উচিত যে, তার পিছনে মুক্তাদীদের অবস্থা একরকম নয়; বরং কেউ দুর্বল, কেউ অসুস্থ, কেউ বয়স্ক, কেউ প্রয়োজনীয় কাজের সাথে জড়িত এমনকি অনেক মায়ের সাথে তাদের ছোট সন্তানও থাকে। তাই লম্বা সূরা দ্বারা এবং যতটুকু যথেষ্ট তার অতিরিক্ত দু’আ ও যিকির দ্বারা নামায দীর্ঘ না করা। একদা এক সাহাবী লম্বা সূরা দ্বারা নামায পড়লে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ‘সাব্বিহিয়া রাস্বিকাল্ আলা, ওয়াশ্ শাম্ সি ওয়া যুহাহা’ দ্বারা নামায পড়তে আদেশ করেন। [বুখারী, আযান অধ্যায়, নং ৭০৫] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

” والسقيم الضعيف منهم فإن فليخفف، للناس مأحدك صلى إذا ”
البخاري رواه- ” شاء ما فليطول لنفسه أحدكم صلى إذا ” و.الكبير

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ২১

“যখন তোমাদের কেউ লোকদের ইমামতি করবে, তখন যেন সে নামায হালকা করে, কারণ তাদের মধ্যে দুর্বল, অসুস্থ ও বয়স্ক লোক থাকে। আর যখন সে একা নামায পড়বে, তখন যত ইচ্ছা দীর্ঘ করবে”। [বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান নং ৭০৩]

৩-প্রয়োজনে ইমামতির সময় অন্যকে স্থলাভিষিক্ত করাঃ

ইমামতিকালে যদি ইমামের অযু নষ্ট হয়ে যায় কিংবা আরো অন্য কারণে তাকে মাঝখানে নামায ছাড়তে হয়, তাহলে তার পিছনে উপস্থিত মুক্তাদীদের কাউকে তার স্থানে করে দিবে। ইমাম কাউকে নির্ধারণ না করলে স্বইচ্ছায় মুক্তাদীদের কেউ ইমাম হয়ে যাবে এবং বাকি নামায পূরণ করবে। এমতাবস্থায় সে ইমামের নায়েব/স্থলাভিষিক্ত ইমাম। সে নতুন করে নামায শুরু থেকে পড়াবে না; বরং যেখান থেকে পূর্বের ইমাম নামায ছেড়েছে সেখান থেকে বাকি নামায পূর্ণ করবে। উমর (রাযিঃ) কে ইমামতি কালে শত্রু ছুরি দ্বারা আঘাত করলে তিনি সাহাবী আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাযিঃ) কে স্থলাভিষিক্ত করেন। [ফাতাওয়া সউদী স্থায়ী উলামা পরিষদ, ৭/৩৯৩-৩৯৫]

উল্লেখ্য, ইমাম যদি অযু ছাড়াই নামায পড়ায়, তাহলে তার নামায বাতিল কিন্তু মুক্তাদীদের নামায সহীহ। [ফাতহুল বারী, ২/২৪৩] আর যদি কোন নির্দিষ্ট মুক্তাদী তার ইমামের বেঅযু সম্পর্কে জানতে পারে, কিন্তু অন্যরা তা না জানতে পারে, তাহলে যে জানে তার নামায বাতিল কিন্তু যারা জানে না তাদের নামায শুদ্ধ। এমতাবস্থায় ইমাম যদি নামাযরত অবস্থায় নিজের অযু নেই তা জানতে পারে, তাহলে সে ততক্ষণঃ অন্যকে তার স্থানে স্থলাভিষিক্ত করে অযু করবে, আর নামায শেষ করার পর জানতে পারলে সে অযু করে নিজের নামায পুনরায় আদায় করবে।

অনুরূপ কোন ইমাম যদি জেনে-বুঝে নাপাকী নিয়ে নামায আদায় করে, তাহলে তার নামায বাতিল। কিন্তু সে যদি অজান্তেই নাপাকী নিয়ে নামায পড়ে অতঃপর নামাযরত অবস্থায় তা জানতে পারে, তাহলে নামাযরত অবস্থায় তা দূর করা সম্ভব হলে দূর করবে যেমন জুতা, মোজা, টুপি বা পাগড়িতে নোংরা লেগে থাকলে তা খুলে ফেলে দিবে এবং নামায পূরণ করবে। [আবু দাউদ নং (৬৫০)/ইবনু খুযায়মা নং (১০১৭) আর নামাযরত অবস্থায় তা দূর করা সম্ভব না হলে নামায ছেড়ে অন্যকে ইমাম করে দিয়ে পাক হবে। তবে নামায শেষ করার পর তা জানতে পারলে সহীহ মতানুসারে তাদের পুনরায় নামায আদায় করতে হবে না। [মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া, ২২/১৮৪-১৮৫]

৪-নামাযে ছোট-বড় সূরা পাঠ ও বিশেষসূরা চয়নে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তরীকা অবলম্বনঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরা ফাতিহার পর সব নামাযে এক ধরনের সূরা পড়তেন না আর না সব নামাযের সময়সীমা এক হত; বরং তিনি কোন ওয়াক্তে দীর্ঘ সূরা পড়তেন আবার কোন সময়ে ছোট। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বেশীরভাগ ক্ষেত্রে শেষের রাকাতগুলির তুলনায় প্রথম রাকাতের কিরাআত দীর্ঘ করতেন। তাই ইমামকে মুক্তাদীদের অবস্থা বুঝে এসব মুশ্ডাহাব বিষয়গুলিরও খেয়াল রাখা উচিত।

আবু ক্বাতাদাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেনঃ “নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যহরের প্রথম দুই রাকাতাতে সূরা ফাতিহা এবং আরো দুটি সূরা পড়তেন, প্রথমটি লম্বা করতেন এবং দ্বিতীয়টি সংক্ষিপ্ত আর অনেক সময় তাঁর আয়াত পড়া শোনা যেত। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসরে সূরা ফাতিহা এবং আরো দুটি সূরা পাঠ করতেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের নামাযের প্রথম রাকাতাত দীর্ঘ করতেন আর দ্বিতীয়টি সংক্ষিপ্ত”। [বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, হাদীস নং ৭৫৯]

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ২২

অন্য বর্ণনায় এসেছে, “তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথম রাকাআত যতখানি দীর্ঘ করতেন ততখানি দ্বিতীয় রাকাআতে করতেন না। এই ভাবে তিনি আসর ও সাকালেও করতেন”। [বুখারী, নং ৭৭৬]

অনুরূপ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমআর ফজরে, জুমআর নামাযে, দুই ঈদের নামাযে এবং বিতরের নামাযে বিশেষ সূরা বেশীরভাগ সময়ে পড়তেন, তাই ইমামকেও তা করা মুস্তাহাব। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমআর দিনে ফজরের প্রথম রাকাআতে আলিফ্ লাম্ মীম তানজীল্ আস্ সাজদাহ (সূরা সাজদাহ) এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা দাহ্ র পাঠ করতেন। [বুখারী, জুমআ অধ্যায়, নং ৮৯১] আর জুমআর নামাযের প্রথম রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ‘আ’লা’ (সাক্বিহিসমা রাক্বিকাল্ আ’লা) এবং দ্বিতীয় রাকাআতে ‘গাশিয়াহ্’ (হাল্ আতাকা হাদীসুল্ গাশিয়াহ) পাঠ করতেন। এমনকি জুমআর দিনে যদি ঈদ একত্রিত হত, তাহলে জুমআহ ও ঈদ উভয় নামাযে এই দুটি সূরা পাঠ করতেন। [মুসলিম, জুমআহ অধ্যায়ঃ নং ২০২৫/আবু দাউদ/তিরমিযী]

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমআর নামাযের প্রথম রাকাআতে সূরা ‘জুমুআহ্’ এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ‘মুনাফেকুন’ ও পাঠ করতেন। [মুসলিম, অধ্যায় জুমুআহ, নং ২০২৩/আবু দাউদ নং ১১২৪/তিরমিযী নং ৫১৯]

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক সাথে তিন রাকাআত বিতর পড়লে প্রথম রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা আ’লা, দ্বিতীয় রাকাতে ‘কাফেরুন’ এবং তৃতীয় রাকাআতে সূরা ‘ইখলাস’ পাঠ করতেন। [সহীহ সুনান নাসাঈ নং ১৬০৬]

৫-সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে ফিরে বসাঃ

ইমাম সালাম ফিরানোর পর কিবলামুখী হয়ে বেশীক্ষণ থাকবেন না বরং; তিনিবার আঙ্গুল ফিরুলগ্ঢ়াহ এবং একবার আলগ্ঢ়াহ্মা আনতাস্ সালাম ও মিনকাস্ সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল্ জালালি ওয়াল্ ইকরাম বলতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ শেষে মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসবেন, এটাই সুন্নত। মুক্তাদীদের দিকে ফিরার সময় ডান দিক কিংবা বাম দিকে ঘুরে অভঃপর মুসলগ্ঢ়ীদের দিকে মুখ করে বসা, উভয় নিয়ম প্রমাণিত। [বুখারী, আযান অধ্যায়ঃ নং ৮৫২, মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফেরীনদের নামায, নং ৭০৮/শারহুল মুমতি, ৪/৩০৫-৩০৬]

ইমামতির বিবিধ মাসাইলঃ

১-যে ইমামকে মুসল্লীগণ অপছন্দ করে তার ইমামতি:

এমন ইমাম যাকে মুসালগ্ঢ়ীরা অপছন্দ করে সেই ইমামের ইমামতি করা মাকরুহ। তবে বিদ্বানগণ মনে করেন, অপছন্দের কারণ যেন দ্বীনী কারণ হয়; কোন দুনিয়াবী কারণ না হয়। অনুরূপ অপছন্দকারীর সংখ্যা যেন বেশী হয়, দু-চার জনের অপছন্দ করা যথেষ্ট নয়।

[নায়লুল আউত্তার, শাওকানী, ৩/২২৫]

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ২৩

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তিনি শ্রেণীর লোকের নামায তাদের মাথার উপর থেকে এক বিষতও উঠানো হয় না (অর্থাৎ তাদের নামায আল্লাহর নিকট কবুল হয় না)।

১-যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ইমামত করে অথচ তাকে তারা অপছন্দ করে।

২-সেই মহিলা যে রাত্রি যাপন করে অথচ তার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট।

৩-পলাতক দাস”। [সহীহ সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং-৭৯২]

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বিষয়টিকে (ছোট ইমামতি) নামাযের ইমামতির সাথে সম্পর্কিত মনে করেন, বড় ইমাম তথা রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষেত্রে মনে করেন না। কারণ রাষ্ট্রপরিচালকের ইমামতি বেশীরভাগ লোকেই অপছন্দ করে। [নায়লুল আউত্বার, ৩/২২৫] (বড় ইমামত ও ছোট ইমামত বিষয়টি ১ম পর্বদেখুন)

২-নফল নামায পাঠকারীর পিছনে ফরয সালাত আদায় করাঃ

কোন ব্যক্তি কোথাও ফরয নামায পড়েছে অতঃপর এমন লোকদের ইমামতি করতে চায়, যারা এখনো সেই ফরয পড়েনি, তাহলে এমন করা বৈধ। এটা ইমামের জন্য নফল হবে এবং লোকদের জন্য ফরয। উলামাগণ এই বিষয়টিকে নফল নামায পাঠকারীর পিছনে ফরয নামায আদায় করা হিসাবে জানেন। সাহাবী মুয়ায নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ইশার নামায আদায় করতেন এবং নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে পুনরায় সেই নামায ইমাম হয়ে আদায় করতেন। [মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, নং ৪৬৫] অন্য বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে, সেটা তার জন্য (মুআযের জন্য) নফল হবে এবং অন্যদের জন্য ফরয। শাফেয়ী ও দ্বারা কুত্বনী বর্ণনা করেন। দেখুন নায়লুল আউত্বার, ৩/২১৩ এবং সউদী স্থায়ী ফতোয়া বোর্ড, ফতোয়া নং ৪৭০৬, লাজনা দায়িমাহ, ৭/৪০১]

উক্ত দলীলের আধারে বুঝা যায় যে, রামাযান মাসে যদি কোন ব্যক্তি ইশার নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে মসজিদে প্রবেশ করে দেখে যে, লোকেরা ইশার নামায শেষ করে তারাবীহ পড়ছে, তাহলে সে ইশার ফরয নামাযের নিয়তে তাদের সাথে নামায পাঠ করবে এবং ইমামের সালাম ফিরানোর পর বাকি রাকাত পূর্ণ করবে। [সউদী ফতোয়া বোর্ড, নং ৬৪৯৬]

৩-ফরয সালাত আদায়কারীর পিছনে নফল সালাত আদায় করাঃ

ফরয নামায আদায়কারী ইমামের পিছনে নফল নামায আদায় করা বৈধ। ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেনঃ ‘আহলে ইলমদের এ বিষয়ে কোন মতভেদ আমাদের জানা নেই’। [মুগনী, ৩/৬৮]

আবু যার গেফরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমার অবস্থা কেমন হবে, যখন শাযকগণ নামায সঠিক সময়ে না পড়ে বিলম্বে পড়বে? আমি বললামঃ এমন সময় আমার করণীয় কি? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ “তুমি সঠিক সময়ে নামায পড়ে নিবে অতঃপর তাদের সাথে সেই নামায পেলে তাও পড়ে নিবে; কারণ সেটা তোমার জন্য নফল হবে”। [মুসলিম]

ইয়াজীদ বিন আসওয়াদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ফজরের নামায আদায় করেন। নামায শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ২৪

সাল্লাম দুই ব্যক্তিকে দেখেন, যারা তাঁর সাথে নামায পড়ে নি। তখন তিনি তাদের দু জনকে ডাকেন। তারা ভয়ে ভয়ে কাছে আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বলেনঃ “তোমরা দুই জনে আমাদের সাথে নামায পড়লে না কেন”? তারা বললঃ আমরা নিজ বাড়িতে নামায পড়েছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ “এমন করো না, যখন তোমরা আপন বাড়িতে নামায পড়বে এবং ইমামকে এমতাবস্থায় পাবে যে, সে এখনো নামায পড়ে নি, তাহলে তার সাথে নামায পড়ে নিবে। কারণ; এটা তোমাদের জন্য নফল হয়ে যাবে”। [আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, দ্বারা কুত্বনী, ইবনুস সাকান এবং ইবনু হিব্বান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, সহীহ আবু দাউদ, আলবানী, নং৫৯০]

৪-নির্দিষ্ট ফরয সালাত আদায়কারীর পিছনে অন্য ফরয আদায় করাঃ

ফরয সালাত আদায়কারী ইমামের পিছনে মুক্তাদী অন্য ফরয নামায আদায় করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ ইমাম আসরের নামায পড়াচ্ছে আর তার সাথে কেউ যহরের নিয়তে যহর আদায় করছে। চাই ইমাম ও মুক্তাদীর নামাযের রাকাআত সংখ্যা এক হোক যেমন আসর আদায়কারীর পিছনে যহর পড়া কিংবা উভয়ের নামাযের রাকাআত সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হোক। যেমন ইশার ফরয নামায আদায়কারী ইমামের পিছনে মগরিব পড়া, কারণঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ “মানুষের আমলসমূহ নিছর করে তার নিয়তের উপরে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পায়, যার সে নিয়ত করে থাকে”। [বুখারী, ১ম হাদীস] তাই এখানে মুক্তাদী ও ইমাম যে যেই নিয়তে নামায পাঠ করবে, সে সেই অনুযায়ী প্রতিফল পাবে।

এ বিষয়ের বৈধতায় উলামাগণ ঐসব দলীল উল্লেখকরেছেন যা, ইতিপূর্বে ফরয আদায়কারীর পিছনে নফল আদায় করা এবং নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায় করার দলীল হিসাবে উল্লেখ হয়েছে।

কেননা যদি ইমাম ও মুক্তাদীর নিয়ত একই হওয়া শর্ত হতো, তাহলে উপরোক্ত বিষয়দুটি বৈধ হত না।

ইবনু হাযম (রহঃ) বলেনঃ ‘না কুরআনে, না সুন্নতে, না ইজমায়, না কিয়াসে এমন কিছু এসেছে যা, ইমাম ও মা’মূমের (মুক্তাদীর) নিয়ত এক হওয়া জরুরী করে। তাই প্রত্যেক এমন বিধান যা কুরআন, সুন্নত এবং ইজমা জরুরী করে না, তা জরুরী নয়’।

[মুহাল্লা, ৪/৩১৬-৩১৭]

একই ফরয নামাযে ইমাম ও মুক্তাদীর নিয়ত ভিন্ন হওয়ার সময় যদি তাদের নামাযের রাকাআত সংখ্যা এক হয়, তাহলে ইমামের পিছনে নামায পাঠকারীর কোন বাড়তি বা ঘাটতি কিছু করতে হয় না, যেমন যহর আদায়কারীর পেছনে আসর পড়া। কিন্তু মগরিব আদায়কারীর পিছনে যদি কেউ ইশা পড়ে, তাহলে সে কী করবে? কারণ এখানে মুক্তাদীর রাকাআত সংখ্যা বেশী। শাইখ ইবনে উসায়মীন (রহঃ) বলেনঃ সে ইমামের সালাম ফিরানোর পর উঠে এক রাকাআত পড়ে নিবে। এই ভাবে যদি কেউ ইশার নামায সম্পাদনকারীর পিছনে মগরিব পড়ে, তাহলে সে কী করবে? কারণ এক্ষেত্রে ইমামের থেকে তার রাকাআত সংখ্যা কম। তিনি বলেনঃ সে দুই নিয়মের যে কোন একটি করতে পারে। তৃতীয় রাকাআতের পর যখন ইমাম চতুর্থ রাকাআতের জন্য দাঁড়াবে তখন সে বসে তাশাহুদদের দুআ পড়ে ইমামের সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করবে, যখন ইমাম চতুর্থ রাকাআত পড়ে সালাম ফিরাবে তখন সেও ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে কিংবা তৃতীয় রাকাআত শেষে যখন ইমাম চতুর্থ রাকাআতের জন্য দাঁড়াবে, তখন সে নিজে তাশাহুদ দিয়ে সালাম ফিরাবে’। এমন দৃষ্টান্ত সালাতুল খাওফের পদ্ধতিতে রয়েছে। [দেখুন, শারহুল মুমতি, ৪/২৬১]

৫-নামাযরত অবস্থায় একাকী নামাযের নিয়ত পরিবর্তন করে

ইমামতির নিয়ত করা কিংবা ইমামতির নিয়ত পরিবর্তন করে মুক্তাদীর নিয়ত করাঃ প্রত্যেক নামাযীকে নামাযের সময় ফরয, নফল, ইমামতি বা মুক্তাদী ইত্যাদির নিয়ত অশুদ্ধ করেতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এক ব্যক্তি একাকী নামায পড়ার নিয়তে দাঁড়িয়েছে ইতিমধ্যে কেউ তার সাথে শরীক হল, এখন কি সে একাকীর নিয়ত থেকে ইমামতির নিয়ত করতে পারে? কিংবা ইমামের অনুপস্থিতিতে কেউ ইমামতি করতে দাঁড়িয়েছে এমনাবস্থায় ইমাম উপস্থিত হয়েছে, তাহলে সে কি ইমামকে আগে করে দিয়ে মুক্তাদীর নিয়ত করতে পারে? বিষয়টিকে উলমাগণ নামাযরত অবস্থায় নিয়ত পরিবর্তন করা শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। একাকী নামাযী প্রয়োজনে নামাযরত অবস্থায় তার নিয়ত পরিবর্তন করে ইমামতির নিয়ত করতে পারে। ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেনঃ একদা আমি আমার খালা মায়মূনা (রাযিঃ) এর নিকট রাত যাপন করি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে উঠে নামায (তাহাজ্জদের নামায) শুরু করেন, তখন আমিও তাঁর সাথে তাঁর বাম পাশে নামাযে দাঁড়িলাম। তিনি আমার মাথা ধরে ডান দিকে করে দেন”। [বুখারী, আযান অধ্যায়, নং ৬৯৯] বুঝা গেল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একা নামাযের নিয়তে দাঁড়ান অতঃপর ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) মুক্তাদী হলে, তাঁকে ইমাম হতে হয়। অন্যদিকে একদা রামাযান মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে একা নামায শুরু করলে ঘিরে ঘিরে অনেক সাহাবী পিছনে তাঁর ইজ্জিদা করে নামায আদায় করেন। [বুখারী, আযান অধ্যায়, নং ৭৩০-৭৩১]

অনুরূপ ইমামতির নিয়ত থেকে মুক্তাদী হওয়াও প্রমাণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানু আমর বিন আউফ গোত্রের মীমাংসা করতে গেলে নামাযের সময় হয়। কোন কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপস্থিতিতে বিনাম্ব হলে মুআয যিন আবু বকর (রাযিঃ) কে ইমামতি করতে বলেন। তিনি ইমাম হয়ে নামায শুরু করলে নবী উপস্থিত হন। লোকেরা ইশারা করলে আবু বকর (রাযিঃ) পিছনে সরে আসেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমামতি করেন। [বুখারী, আযান অধ্যায়, নং ৬৮৪] বুঝা গেল, আবু বকর (রাযিঃ) ইমামতির নিয়ত পরিবর্তন করে মুক্তাদী হলেন।

মুক্তাদী সংক্রান্ড মাসআলা-মাসাইলঃ

যদিও আমাদের আলোচনা ইমাম ও ইমামতিকে কেন্দ্র করে কিন্তু যেহেতু মুক্তাদী ছাড়া ইমাম ধারণা করা যায় না অর্থাৎ ইমাম ও মুক্তাদী একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত তাই এ পর্যায়ে আমরা মুক্তাদীর মাসআলা-মাসাইল নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

১-মুক্তাদীগণ নামাযের উদ্দেশ্যে কখন কাতারবদ্ধ হবেন?

নামায শুরু হওয়ার সময় ইমাম যদি মসজিদের ভিতরে পূর্ব থেকে অবস্থান না করেন; বরং তাঁর বাসস্থান থেকে এসে ইমামতির স্থানে দাঁড়ায় তবে (নামাযের সময় হয়ে গেলে) মুক্তাদীগণ ইমামকে মসজিদে আসতে দেখলেই নামাযে দাঁড়াবেন এবং মুয়াযযিন ইকামত দিবেন, যদিও এখনও ইমাম তাঁর ইমামতির স্থানে না পৌঁছে থাকেন।

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ২৬

আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, ‘নামাযের জন্যে ইকামত দেয়া হত, আর লোকেরা কাতারে অবস্থান নিত, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্থানে অবস্থান নেয়ার পূর্বে। [মুসলিম, মাসাজিদ অধ্যায়, নং ১৩৬৮] অবশ্য ইমাম তাঁর স্থানে অবস্থান নেয়ার সময়ও মুয়াযযিন ইকামত দিতে পারে, তাতে নিষেধের কিছু নেই।

উল্লেখ্য থাকে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরয নামায সমূহের আগে ও পরের সুন্নতগুলি তাঁর গৃহেই আদায় করতেন। তাই তাঁর মসজিদে আসাটাই ফরয নামায শুরু করার সময় ও অনুমতি ধরে

নেওয়া হত। আর যদি ইমাম মসজিদেই থাকেন, তাহলে তিনি যখন মুয়াযযিনকে অনুমতি দিবেন বা নামায আরম্ভ করার নির্ধারিত সময় হবে, তখন বাকি মুসালগ্গীরা কাতারবদ্ধ হবেন। কিন্তু ঠিক ইকামতের কোন শব্দের সময় উপস্থিত মুসালগ্গীরা কাতারবদ্ধ হওয়ার জন্য দাঁড়াবেন, তা নিয়ে কিছু মতামত পাওয়া যায়। কেউ বলেনঃ ইকামত শেষ হওয়ার সময় মুসালগ্গীরা দাঁড়াবেন। কেউ বলেনঃ মুয়াযযিন যখন “ক্বাদ ক্বামতিস্ব স্বালাহ” বলবেন, তখন দাঁড়াবেন। কেউ বলেনঃ আলগ্গাছ আকবার বলার সময় দাঁড়াবেন। আসলে এ বিষয়ে বিভিন্ন দলীলের দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, মুসালগ্গীগণ ইমামকে ইমামতির স্থানে আসতে দেখলে, বা তাঁর স্থানে অবস্থান নিলে, মুয়াযযিন ইকামত দেওয়া শুরু করবেন এবং মুক্তাদীরা তাদের সাধ্যমত কাতারবদ্ধ হতে শুরু করবে, একটু আগে বা পরে হলে সমস্যার কিছু নেই, তবে নেকীর কাজে দ্রুতগামী হওয়াই বেশী ভাল। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেনঃ ‘নামাযের ইকামতের সময় মুক্তাদীদের দাঁড়ানোর বিশেষ সময়সীমা সম্পর্কে আমি কিছু শুনিনি। তাই আমি লোকদের সাধ্যানুযায়ী এটা প্রজোয্য মনে করি; কারণ তাদের মধ্যে অনেকে ভারী শরীর-স্বাস্থ্যের লোক থাকেন আর অনেকে হালকা স্বাস্থ্যের’ [নায়লুল আউত্ত্বার, ৩/২৪৪]

২-ইমামের অনুসরণ করা মুক্তাদীদের অবশ্য কর্তব্য :

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

رَكَعٌ فَإِذَا قِيَامًا فَصَلُّوا قَائِمًا صَلَّى فَإِذَا، بِهِ لِيُؤْتَمَّ الْإِمَامُ جُعِلَ إِنْشَاءُ
“فَارْفَعُوا رَفْعًا إِذَا وَ، فَارْكَعُوا

“ইমাম নির্ধারণ করা হয়, তার অনুসরণ করার জন্য, তাই যখন সে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে, তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়, যখন সে রুকু করবে, তখন তোমরাও রুকু করো আর যখন সে উঠবে, তখন তোমরাও উঠো” [বুখারী, আযান অধ্যায়, নং ৬৮৯]

ইমামের অনুসরণের ক্ষেত্রে মুক্তাদীদের অবস্থা চার ভাগে বিভক্তঃ

১-মুত্বাবাআ’হ বা অনুসরণঃ নামাযের কাজ সমূহ ইমামের পরে পরে করা; ইমামের সাথে সাথে নয়। এটাই সুন্নাত এবং মুক্তাদীগণ এমন করতেই আদিষ্ট, যা উপরের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

২-মুআফাকা’হ বা ইমামের সাথে সাথে করাঃ ইমামের সাথে সাথে করা আবার দুই ভাগে বিভক্ত। যথা:

(১) নামাযের কর্ম বিষয়ক অংশগুলি তার সাথে সাথে সম্পাদন করা যেমন, ইমাম রুকু করলে তার সাথে একই সময়ে রুকু করা।

(২) নামাযের কাউল বা বচন বিষয়ক অংশগুলি তার সাথে সাথে করা যেমন, ইমাম আলগ্গাছ আকবার বললে তার সাথে সাথে বরাবর সময়ে আলগ্গাছ আকবার বলা।

বাচনিক বিষয়গুলিতে তাকবীরে তাহরীমা এবং সালাম ব্যতীত বাকি বিষয়গুলি ইমামের সাথে সাথে বা পরে করলে কোন সমস্যা নেই। উদাহরণ স্বরূপ, ইমামের রুকুতে ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম’ বলার সময় মুক্তাদীর ইমামের আগে বা পরে কিংবা সাথে সাথে তা বললে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু তাকবীরে তাহরীমা ইমামের আগে হলে কিংবা ইমামের ‘আলগ্গাছ

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ২৭

আকবার' বলা শেষ হওয়ার পূর্বেই মুক্তাদীর তা বলা হলে নামায শুদ্ধ হবে না। এই ভাবে ইমামের সালামের সাথে সাথে সালাম ফিরালে উলামাগণ এমন করাকে মাকরুহ বলেছেন। আর মুক্তাদীদের নামাযের কর্ম বিষয়ক অংশগুলিতে ইমামের সাথে সাথে করা মাকরুহ। উদাহরণ স্বরূপ ইমাম যখন আলগা হু আকবার বলে রুকুতে যান, তখন ইমামের সাথে সাথে মুক্তাদীর একই সময়ে বুকুে রুকুতে যাওয়া। এটা ঠিক নয়। কারণ হাদীসে ইমামের পরে তা করতে আদেশ করা হয়েছে; সাথে সাথে নয়।

৩-তাখালুফ বা ইমামের পরে দেরীতে করাঃ এটা দুই ভাগে বিভক্ত। যথা:

- (১) দেরীতে করায় ওজর থাকা, যেমন কোন মুক্তাদী কিয়াম অবস্থায় আছে অন্য দিকে ইমাম রুকুতে গেছেন কিন্তু সে ইমামের তাকবীর শুনতে পাই নি, যখন শুনতে পাচ্ছে তখন ইমাম সামিয়ালগা হু লিমান হামিদাহ বলছেন। এমতাবস্থায় সেই মুক্তাদী তাৎক্ষণাত রুকু করবে এবং ইমামের বাকি কাজে অনুসরণ করবে; কারণ এখানে তার ওজর রয়েছে।
- (২) বিনা ওজরে দেরী করা, যেমন ইমাম রুকুতে গেছে আর মুক্তাদী দাঁড়িয়েই আছে। যখন ইমাম রুকু থেকে উঠছে, তখন সে রুকুতে যাচ্ছে। এই ভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রে। এমতাবস্থায় মুক্তাদী যদি নামাযের কোন রুকুনকে জেনে-বুঝে ইমামের সেই রোকন শেষ হওয়ার পর করে, তাহলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে।

৪-মুসাব্বাহ বা ইমামের পূর্বে করাঃ যেমন ইমামের পূর্বে রুকু/সাজদা করা কিংবা ইমামের পূর্বে রুকু/সাজদা থেকে উঠা। যদি কেউ জেনে-বুঝে স্বেচ্ছায় এমন করে তাহলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি অজ্ঞতা বশতঃ কিংবা ভুলে করে, তাহলে তার নামায শুদ্ধ। এমন আচরণকারীর জন্য কঠোর শাস্তির উল্লেখকরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “সে ব্যক্তি কি ভয় করে না যে তার ইমামের পূর্বে নিজের মাথা উত্তলন করে, আল্লাহ তায়ালা চাইলে তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিবর্তন করে দিবেন কিংবা তার আকৃতিকে গাধার আকৃতির ন্যায় করে দিবেন”। [বুখারী, আযান অধ্যায়, নং ৬৯১, মুসলিম, স্বালাত অধ্যায়ঃ নং ৪২৭] এ বিষয়ে একটি ফেকহী মূলনীতিও রয়েছে, ‘ইবাদতে ইচ্ছাকৃত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করা, ইবাদতকে বাতিল করে দেয়’। [উপরোক্ত প্রকারগুলি বিস্ফুরিত দেখুন, আশ্ শারহুল মুমতী, ইবনু উসায়মীন, ৪/১৮০-১৯০]

৩- ইমামের পিছনে মুক্তাদীগণের সূরা ফাতিহা পাঠঃ

এটি একটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের উলামাগণ মতভেদ করেছেন। আমরা খুবই সংক্ষিপ্তাকারে এ স্থানে দলীল সহ তাঁদের মতামতের বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

ইমামের পিছনে মুক্তাদী হয়ে নামায আদায়কারীকে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে কি না? এ বিষয়ে প্রধান তিনটি মত বিদ্যমান। যথা:

১ম মতঃ ইমামের পিছনে মুক্তাদী হয়ে নামায আদায়কারীকেও অবশ্যই সূরা ফাতেহা পাঠ করতে হবে। এই মতের প্রধান দলীলাদিঃ

ক-নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

الكتاب بفاتحة يقرأ لمن صلاة [لا

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ২৮

“তার নামায হয় না যে সূরা ফাতেহা পড়ে না”। [বুখারী, অধ্যায়, আযান, অনুচ্ছেদঃ প্রত্যেক নামাযে ইমাম ও মুক্তাদী সকলের প্রতি কিরাআত জরুরী, নং ৭৫৬]

প্রমাণিত হয় যে, সূরা ফাতেহা ব্যতীত কোন নামাযই হয় না, চাই তা ফরয হোক বা নফল বা একা একা পড়া হোক বা ইমামের পিছনে; কারণ এখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী ব্যাপকার্থ বোধক।

খ-নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ

[.تَمَامٌ غَيْرُ ثَلَاثَا خِدَاجٌ فَهِيَ الْقُرْآنُ بِأَمٍّ فِيهَا يَقْرَأُ لَمْ صَلَاةٌ صَلَّى مَنْ]

“যে ব্যক্তি এমন কোন নামায পড়ল, যাতে সে সূরা ফাতিহা পড়লো না, তাহলে সেই নামায অসম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ -অপূর্ণাঙ্গ”। [মুসলিম, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব, নং ৮৭৬]

প্রমাণিত হল যে, সূরা ফাতেহা ছাড়া কোন নামাযই পূর্ণাঙ্গ নয়, চাই সে নামায একা পড়া হোক বা ইমামের সাথে। উল্লেখ্য যে, অসম্পূর্ণ শব্দটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাগীদের সাথে তিন বার বলেন।

গ-একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাদের নিয়ে ফজরের নামায পড়ালেন। নামায শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ কে তার পিছনে কুরআন পড়ছে? কিংবা বললেনঃ তোমরা কি তোমাদের ইমামের পিছনে কিছু পড়ে থাক? তারা বললেনঃ হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ সূরা ফাতিহা ব্যতীত এমনটি করো না; কারণ যে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না তার নামাজ হয় না”। [আবু দাউদ, নং ৮২৩, তিরমিযী, নামায অধ্যায়ঃ অনুচ্ছেদঃ ইমামের পিছনে কিরাআত, নং ৩১০/আহমদ/হাকেম, সূত্র হাসান, দেখুন তুহফাতুল আহওয়ায়ী, ২/১৯৩-১৯৪]

প্রমাণিত হল যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের কেবল সূরা ফাতিহা পড়তে হবে; অন্য কিছু নয়।

২য় মতঃ ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের কখনও সূরা ফাতিহা বা অন্য কোন সূরা পড়তে হবে না বরং চুপ থেকে ইমামের কিরাআত শুনতে হবে। এই মতের দলীলাদিঃ

ক-আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿الْأَعْرَافُ﴾ (تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ أَنْصِتُوا وَ لَهُ فَاسْتَمِعُوا الْقُرْآنَ فُرَىٰ إِذَا وَ)

“যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর ও চুপ থাক।” [সূরা আরাক/২০৪]

বুঝা গেল, কুরআন পড়া হলে চুপ থেকে ভালভাবে শুনতে হবে। তাই ইমাম যেহেতু নামাযে কুরআন পড়েন, সেহেতু মুক্তাদীদের চুপ থেকে শুনতে হবে। কোন সূরা পড়া যাবে না।

আপত্তিঃ (১) যদি এই আয়াতের মর্ম এই হয় যে, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহাও পড়া যাবে না, তাহলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেন বললেন যে, সূরা ফাতিহা ছাড়া কোন নামায হয় না বা তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু পড়বে না? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি তাহলে কুরআনের বিপরীত আদেশ দিলেন? (নাউয়ু বিলাহ)

আপত্তিঃ (২) যদি এই আয়াতকে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়ার দলীল ধরেও নেওয়া হয়, তাহলে যুহর ও আসর নামাযে যখন ইমাম চুপি চুপি কিরাআত করেন, তখন তো মুক্তাদীরা কুরআন পাঠ শোনে না, এমতাবস্থায় তারা কী করবে? তাই এই আয়াত উপরোক্ত মতের পূর্ণাঙ্গ দলীল হয় না।

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ২৯

খ-নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “যার ইমাম রয়েছে, তার ইমামের কিরাআত তার কিরাআত হিসাবে গণ্য হবে”। [ইবনু মাজাহ, অধ্যায়, ইকামাতুস স্বালাহ, নং ৮৪০]

বুঝা গেল, মুক্তাদীকে কোন কিছু পাঠের প্রয়োজন নেই। কারণ ইমামের কিরাআত করাটা তারও কিরাআত ধরা হবে।

আপত্তিঃ (১) হাদীসটি অত্যন্ড দুর্বল-যয়ীফ। অবশ্য আলবানী (রহঃ) সহ কেউ কেউ হাসান বলার চেষ্টা করেছেন। উক্ত বর্ণনার রাবী জবীর(বিন ইয়াযীদ ইবনুল হারিস) যঈফ বা দুর্বল রাফিজী, ইবনুল জাররাহ তাকে সিকাহ বলেও, আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, তিনি মিথ্যা কথা বলেন। ইয়াহইয়া বিন মঈন বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবু দাউদ আস-সাজিসতানি বলেন, তিনি নিম্নর যোগ্য নন। আল-জাওয়জানী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। (তাহক্বীক ইবনে মাজাহ, আলবানী) ইবনে হাজার (রহঃ) বলেনঃ এই হাদীসটি সকল হাদীস বিদ্বানদের নিকট যয়ীফ (দুর্বল) বলে পরিচিত। [ফাতহুল বারী, ২/৩১৪, তালখীসুল হাবীর, ১/৫৬৯] (২) এই রকম একটি দুর্বল হাদীসের মুকাবিলায় উপরোক্ত বুখারী, মুসলিম সহ অন্যান্য সুনান গ্রন্থের সহীহ হাদীসকে কিভাবে প্রত্যাখ্যান করা যায়?

৩য় মতঃ জেহরী অর্থাৎ যে সব নামাযে ইমাম সরবে সূরা পাঠ করেন (যেমন ফজর, মাগরিব ও ইশা) এসব নামাযে পড়তে হবে না কিন্তু যে সব নামাযে সূরা নিরবে পাঠ করা হয় (যেমন, যুহর ও আসর) তাতে পাঠ করা আবশ্যিক। এই মতের দলীলঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “যখন তোমরা নামায আদায় করবে, তখন কাতার সোজা করে নিবে, তোমাদের মধ্যে কেউ ইমামতি করবে, যখন সে তকবীর দিবে তখন তোমরাও দিবে.. আর যখন সে পাঠ করবে, তখন তোমরা চুপ থাকবে”। [মুসলিম, স্বালাত অধ্যায়, স্বালাতে তাশাহুদে বর্ণনা, নং ৪০৪/ নাসাঈ নং ৯১২]

আপত্তিঃ হাদীসটির সনদ সহীহ হলেও হাদীসের যেই অংশ থেকে এই মতের দলীল দেয়া হচ্ছে অর্থাৎ যখন সে পাঠ করবে, তখন তোমরা চুপ থাকবে সেই অংশটিকে উঁচু পর্যায়ের মুহাদ্দিসগণের অনেকেই গাইর মাহফূয (অসংরক্ষিত) বলেছেন। যেমন ইমাম বুখারী, ইয়াহইয়া বিন মঈন, আবু দাউদ, আবু হাতিম, হাকেম, দারা কুত্বনী, ইবনু খুযাইমাহ, হাফেয আবু আলী নীসাপুরী, বায়হাক্বী, ইমাম নবভী প্রমুখ। [দেখুন, তাহক্বীকুল কালাম, সাহেবে তুহফা, ২/৮৭] ইমাম নবভী বলেনঃ ‘এই বাক্যটির দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে হাদীসের পন্ডিতদের একমত হওয়া মুসলিমের সিহহাতের উপর প্রধান্য পাবে। বিশেষ করে যখন তিনি তাঁর সহীহ মুসলিমে বর্ণনাটি মুসনাদাকারে বর্ণনা করেন নি’।

[শারহ মুসলিম, নভবী, ৪/১২৮, রিয়াদে ছাপা]

উল্লেখ্য, হাদীস বিশারদদের নিকট গাইর মাহফূয বাক্য যয়ীফ হওয়ার কারণে অগ্রহণীয়। তাই এই অংশ দলীল যোগ্য নয়।

অগাধিকারপ্রাপ্ত মতঃ প্রথম মত। অর্থাৎ মুক্তাদীদেরকে ইমামের পিছনে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। আর ফাতিহার পর ইমাম যা পাঠ করবেন তা শুনতে হবে।

কারণঃ

১- প্রথম মতের দলীলগুলো বেশী স্পষ্ট ও বেশী শুদ্ধ। তাই দলীলের বিবেচনায় ১ম মত প্রাধান্যযোগ্য।

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৩০

২-“যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর ও চুপ থাক।” [সূরা আরাফ/২০৪] এবং ‘যখন ইমাম পাঠ করবে তখন তোমরা চুপ থাক’ এদুটি সূরা ফাতিহা সহ বাকি কুরআনের ক্ষেত্রে আম বা ব্যাপক আদেশ যা, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার দলীল দ্বারা নির্দিষ্ট বা খাস করা হবে। যেন উভয় মতের দলীলাদির প্রতি আমল করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ কুরআন পড়াকালে চুপ থেকে শোনা সাধারণ সময়ের জন্য প্রযোজ্য হবে এমনকি নামাযের সময়ে সূরা ফাতিহার অতিরিক্ত কিরাআতের জন্য প্রযোজ্য হবে কিন্তু সূরা ফাতিহা পাঠকালে তা প্রযোজ্য হবে না বরং মুক্তাদীরাও তা পাঠ করবে।

৩-যে সব দলীলে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়ার কথা এসেছে, সে সব দলীলের অর্থ হবে উচ্চ স্বরে পড়া নিষেধ। কারণ উচ্চ স্বরে পড়লে ইমামের কিরাআতে বিঘ্ন ঘটে কিন্তু নিরবে পড়লে তা হয় না। তাই যখন সাহাবী আবু হুরায়রা (রাযিঃ) কে ইমামের পিছনে থাকলে কি করবো প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি বলেনঃ “মনে মনে পড়ে নিবে।” [মুসলিম, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ প্রত্যেক রাকআতে কিরাআত জরুরী]

৪- ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের সশব্দে আমীন বলাঃ

জাহরী তথা সশব্দিক নামাযে ইমাম যখন আমীন বলবেন তার পর মুক্তাদীদেরকেও জোর শব্দে আমীন বলতে হবে। “নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যখন ইমাম আমীন বলবে তখন তোমরাও আমীন বলো; কেননা যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে খাপ খেয়ে যাবে, তার বিগত পাপ ক্ষমা করা হবে”। ইবনু শিহাব বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমীন বলতেন। [আ টেনে বলতেন] [বুখারী ও মুসলিম, বুখারী, আযান অধ্যায়ঃ নং ৭৮০]

উপরের হাদীসে যেমন ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের আমীন বলা প্রমাণিত হয়, তেমন উভয়ের তা জোরে বলাও প্রমাণিত হয় কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদেশ যে, যখন ইমাম আমীন বলবে, তখন তোমরাও বলবে। অর্থাৎ যখন তোমরা ইমামের আমীন বলা শুনতে পাবে নচেৎ সিরী বা নিরব নামাযে ইমাম কখন আমীন বলে তা শোনা অসম্ভব। আর ইমাম জোরে আমীন বললে মুক্তাদীকেও জোরে বলতে হবে। এমন নয় যে ইমাম জোরে বলবে আর মুক্তাদীরা নিরবে।

ওয়ায়েল বিন হুজ্জ র হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমি নবীজীকে পড়তে শুনেছি, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পড়লেনঃ (গায়রিল মাগ যুবী আলাইহিম্ ওয়া লায যা-ল্লীন) এবং বললেনঃ আমীন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর শব্দকে টেনে পড়লেন”। [তিরমীযী, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ আমীন প্রসঙ্গ/আবু দাউদ, আহমদ, বায়হাকী]

‘আমীন’ আস্লে বলা বর্ণণা সবই দলীলের অযোগ্যঃ (সংকলক)

(১) আলক্বামা ইবনে ওয়াইল (র) তার পিতা ওয়াইল বিন হুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) গাইরীল মাগদুবী আলাইহিম ওয়ালাদ্বলিন তিলাওয়াত করার পর ‘আমীন’ বললেন এবং তিনি তা আস্লে (নিম্নস্বরে) বললেন। (হাদীসটি ‘মুযতারীব’ হা/তিরমীযী, ফিঃ হাঃ ইঃ ও দর্শন গ্রন্থ থেকে)।

১৭টি হাদীসের মধ্যে আস্লে ‘আমীন’ বলার পক্ষে এই একটি হাদীস। হাদীসটি এসেছে এরকম, শোবা (রহঃ) এই হাদীসটি সালামা ইবনে কুহায়ল হুজর আবুল আশ্বাস আলকামা ইবনে ওয়াইল তার পিতা ওয়াইল (রাঃ) এর সুত্রে বর্ণনা করেছেন যে, **রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ‘গাইরিল মাগদুবী আলাইহিম ওয়ালাদ্বলীন’ পাঠের পর جَفَضَ أَوْ أَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৩১

অর্থাৎ নিম্ন স্বরে ‘আমীন’ বলেছেন। (হাদীসটি মুযতারিব)। (তিরমিযী বঙ্গানুবাদ-২৪৯), (আহাম্মদ ও দারকুতুনী তে এসেছে হা/১২৫৬ এর ভাষ্য)।

কিন্তু একই বর্ণনায় সুফিয়ান ছাওরী (রাঃ) বলছে ‘আমীন’ رفع بها صوتে উচ্চস্বরে বলেছেন। (আহাম্মদ দারকুতুনী হা/১২৫৬, নায়লুল আওতার ৩য় খন্ড ৭৫ পৃষ্ঠা)। হাদীসের বিশ্লেষণকারীরা বলেছেন নিম্ন স্বরে আমীন বলার হাদীসটি “মুযতারিব” (যে হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়) যার সনদ মতনে নাম ও শব্দগত ভুল থাকার কারণে ‘যঈফ’। পক্ষান্তরে সুফিয়ান ছাওরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি এসব ত্রুটি মুক্ত হওয়ায় সহীহ।

বর্ণনাটি সম্বন্ধে তিরমিযী (রহঃ) বলেন, মুহাম্মদকে (ইমাম বুখারীকে) বলতে শুনেছি যে, সুফিয়ানের বর্ণনা শোঁবার চেয়ে অধিক সহীহ। এই বর্ণনায় শোঁবা অনেক জায়গায় ভুল করেছে। সে বর্ণনা করেছে হুজুর আবুল আনবাস থেকে। অথচ তিনি হলেন হুজুর বিন আনবাস। তার উপাধী হলো আবু সাকান। সে বৃদ্ধি করেছে আলকামা বিন ওয়ায়েল অথচ তাতে আলকামা নেই। মূলত তা হবে, ওয়ায়েল বিন হুজর থেকে হুজর বিন আনবাস। এছাড়া সে বলেছে, ‘তিনি নিম্নস্বরে বলেন’। অথচ তা হবে ‘তিনি তার স্বর উচ্চ করেন’।

(তিরমিযী ১/৫৮ পৃষ্ঠা)।

ইমাম তিরমিযী আরও বলেন, এই হাদীস সম্পর্কে আমি আবু যুর’আকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি উত্তরে বললেন, শোঁবার হাদীসের চেয়ে সুফিয়ানের বর্ণিত হাদীস অধিকতর সহীহ।

(এ হা/২৪৮ এর শেষাংশ)।

শুঁবাহর ভুলঃ

শুঁবাহর প্রথম ভুল এই যে, তিনি হুজরকে আমবাসের পিতা বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃত কথা এই যে, হুজর আমবাসের পিতা নন, পুত্র। আর তার কুনিয়াত হচ্ছে আবু সাকান। (তিরমিযী আহমদী ছাপা ৪৯ পৃষ্ঠা)।

ও **তাঁর দ্বিতীয় ভ্রান্তি** এই যে, এই হাদীসের সানাদে আলকামা বিন ওয়ায়েলকে অতিরিক্ত আমদানী করা হয়েছে। অথচ এর আসল সনদে তাঁর উল্লেখ নেই।

তাঁর তৃতীয় ভুল এই যে, হাদীসের মতনে তিনি যেখানে বলেন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমীন শব্দটি আঙ্গুড় বললেন প্রকৃত পক্ষে তা হবে যে, তিনি আমীন সশব্দে উচ্চারণ করলেন। স্বয়ং মোল্লা আলী কারী হানাফী তদীয় মিশকাতের শরাহ মিরকাতে অকুঠ ভাষায় স্বীকার করেছেন যে, হাদীসবিদগণ শুঁবার এই ভুল সম্পর্কে একমত। তিনি বলেন, সর্বস্বীকৃত সঠিক কথা হচ্ছে ‘মাদ্দিবিহা সাওতাছ ও রাফা’আ বেহা সাওতাছ’ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমীনের শব্দ দারাজ কঠে পড়লেন এবং উচ্চকঠে পড়লেন। লম্বা করে টেনে পড়ার কথা তিরমিযী, আহমাদ ও ইবনু আবী শায়বা রিওয়ায়াত করেছেন আর উচ্চকঠে পড়ার কথা আবু দাউদ রিওয়ায়াত করেছেন। এতদ্ব্যতীত বায়হাক্বী তদীয় হাদীস গ্রন্থে ও ইবনু হিব্বান স্বীয় সহীতে ‘আত্বার বাচনিক রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি বলেন, “আমি সাহাবীগণের মধ্যে এমন দু’শত জনকে পেয়েছি যারা ইমাম ওয়াযযাললীন বলার পর বুলন্দ আওয়াজে আমীন বলতেন”।

শুঁবাহর হাদীস যে যঈফ সে সম্পর্কে তাঁর উপরোল্লিখিত ৩টি ভ্রান্তি এবং মোলণা আলী কারীর উপরোদ্ধৃত মশ্ভুবের পর কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। এর উপর তার বর্ণিত সনদে দেখা যায়, আলকামা তদীয় পিতা ওয়ায়েল হতে এই হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু মজার কথা এই যে, তিনি তাঁর পিতার নিকট এই হাদীস শুনেননি-শুনতে পারেন না। এ সম্পর্কে হাফিয় ইবনু হাজার তদীয় ‘তকরীবুত তাহযীব’ নামক রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থে কি বলেন- পাঠক মনযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন! তিনি বলেন, ‘আলকামাহ বিন ওয়ায়েল বিন হুজর- (পেশযুক্ত হা ও সাকিনযুক্ত জীম) হাজরামী কুফী (রাবী হিসাবে) সত্যবাদী (সন্দেহ

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৩২

নাই) কিন্তু নিশ্চিত কথা এই যে, তিনি তাঁর পিতা হতে হাদীস শ্রবন করেননি। পিতার নিকট হতে পুত্র কোন হাদীস শ্রবন করতে পারেননি সে কথার রহস্য উদ্ঘাটন করে দিয়েছেন শায়খ ইবনু হুমাম হানাফী স্বীয় ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে। তিনি ওটাতে লিখেছেন : অর্থাৎ ইমাম তিরমিযী স্বীয় ইলালে কবীর গ্রন্থে উল্লেখকরেছেন যে, তিনি ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আলকামা স্বীয় পিতার নিকট হাদীস শ্রবন করেছিলেন? তদুত্তরে ইমাম বুখারী (হাঁ, না কিছুই না বলে বললেন) তিনি (আলকামা) স্বীয় পিতার মৃত্যুর ৬ মাস পর জন্মগ্রহণ করেন। (ফাতহুল কাদীর, নলকিশোর ছাপা ১ম খন্ড ১২১ পৃষ্ঠা)।
অতএব এজন্য হাদীসটি দ্বারা দ্বীনি আমলের দলীল সাব্যস্ত হতে পারে না

হযরত ওমর (রা.) বলেন, চারটি বিষয় ইমাম অনুচ্চস্বরে পাঠ করবে : আউযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমীন ও আল্লাহুমা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ।

أربع يخفيهن الإمام : التَعَوُّذُ وَبِسْمِ اللَّهِ
الرحمن الرحيم وأمين واللهم ربنا ولك
الحمْد

(ইবনে জারীর, কানযুল উম্মাল ৮/২৭৪; বিনায়াহ ২/২১৯)

অপত্তিঃ এই হাদিসটি মুনকাতি হওয়ার কারণে যঈফ। কারণ হাদিসটি ইব্রাহিম নাখয়ী বর্ণনা করেছেন উমার (রা.) হতে। আর ইব্রাহিম নাখয়ী উমার (রাঃ) কে পান নাই। এছাড়া আরো একটি বর্ণনা রয়েছে আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা হতে উমার বিন খাত্তাব রা. এর বর্ণনা। সেটিও মুনকাতি। কারণ আবদুর রহমান বিন আবী লায়লাও উমার বিন খাত্তাব রা. কে পান নাই। (তাহযিবুত তাহযিব)। সুতরাং হাদিসটি দলিলযোগ্যও নয়, প্রমাণিতও নয়।

আবু ওয়াইল (রাহ.) বলেন, খলীফায়ে রাশেদ আলী রা. ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বিসমিলগ্হা উচ্চ আওয়াজে পড়তেন না। তেমনি আউযুবিলগ্হাও আমীনও।

كَانَ عَلِي وَعَبْدُ اللَّهِ لَا يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللَّهِ
الرحمن الرحيم وَلَا بِالتَّعَوُّذِ، وَلَا
بِالتَّأْمِينِ، قَالَ الْهَيْثَمِيُّ : رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي
الْكَبِيرِ وَفِيهِ أَبُو سَعْدٍ الْبُقْعَالِ، وَهُوَ ثَقِيٌّ
مَدْلَسٌ.

(আলমুজামুল কাবীর, হাদীস : ৯৪০৪; মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১০৮)

অপত্তিঃ হাদিসটি যঈফ। কারণ হাদিসটির সানাদে রয়েছেন, আবু সাঈদ বিন আল মারযাবান আল বাকাল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি মুনকারুল হাদিস; ইমাম আমর বিন আলী বলেন, তিনি মাতরুকুল হাদিস; ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি মাতরুক; ইমাম নাসাঈ বলেন, তিনি যঈফ; ইমাম ইজলী বলেন, তিনি যঈফ; ইমাম আবু হাতেম বলেন, তিনি হাদিসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নন। এছাড়াও আরো অনেকেই এই রাবীর সমালোচনা করেছেন (তাহযিবুত তাহযিব)। এছাড়া আবু সাঈদ বিন আল মারযাবান আল বাকাল মুদাল্লিস এবং মুদাল্লিস রাবীর (বর্ণনাকারীর) আন শব্দে বর্ণিত হাদিস দলিল হিসেবে অগ্রহণযোগ্য। হাদিসটি যঈফ হওয়ার এটিও অন্যতম কারণ।

মোট কথা জমহুর মুহাদ্দিসিনের নিকট তিনি যঈফ। তাই দলিলটি অগ্রহণযোগ্য। অথচ হানাফীরা এসব অগ্রহণযোগ্য যঈফ হাদিসই দলিল হিসেবে দিয়ে থাকে নিজেদের মাহাববী মতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। আর মুকাল্লিদরা সেগুলো প্রচার করে এবং নিজেদের হুজুরদের আকড়ে ধরে অন্ধের মতো।

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৩৩

আবু ওয়াইল থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর (রা.) ও হযরত আলী (রা.) বিসমিলগাছ উচ্চস্বরে পড়তেন না।

لَمْ يَكُنْ عَمْرٌ وَعَلِيٌّ يَجْهَرَانِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا بِأَمِينٍ

(ইবনে জারীর তবারী ; আলজাওহারুন নকী ১/১৩০)

আপত্তিঃ এই হাদিসটিও যঈফ। কারণ হাদিসটির সানাদে রয়েছে, আবু সাঈদ বিন আল মারযাবান আল বাকাল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি মুনকারুল হাদিস; ইমাম আমর বিন আলী বলেন, তিনি মাতরুকুল হাদিস; ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি মাতরুক; ইমাম নাসাঈ বলেন, তিনি যঈফ; ইমাম ইজলী বলেন, তিনি যঈফ; ইমাম আবু হাতেম বলেন, তিনি হাদিসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নন। এছাড়াও আরো অনেকেই এই রাবীর সমালোচনা করেছেন (তাহযিবুত তাহযিব)। এছাড়া আবু সাঈদ বিন আল মারযাবান আল বাকাল মুদাল্লিস এবং মুদাল্লিস রাবীর (বর্ণনাকারীর) আন শব্দে বর্ণিত হাদিস দলিল হিসেবে অগ্রহণযোগ্য। হাদিসটি যঈফ হওয়ার এটিও অন্যতম কারণ।

মোট কথা জমহুর মুহাদ্দিসিনের নিকট তিনি যঈফ। তাই দলিলটি অগ্রহণযোগ্য। অথচ হানাফীরা এসব অগ্রহণযোগ্য যঈফ হাদিসই দলিল হিসেবে দিয়ে থাকে নিজেদের মাযহাবী মতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। আর মুকাল্লিদরা সেগুলো প্রচার করে এবং নিজেদের হুজুরদের আকড়ে ধরে অঙ্গের মতো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, ইমাম তিনটি বিষয় অনুচ্চস্বরে পড়বে : আউয়ুবুল্লাহ ..., বিসমিল্লাহ ... ও আমীন।

يُخْفِي الْإِمَامُ ثَلَاثًا : الْأَسْمَاءُ تَعَاذُ وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَمِينَ

(আলমুহাল্লা ৩/১৮৪)

আপত্তিঃ হাদিসটির সম্পূর্ণ সানাদ নিম্নে দেওয়া হলো

আবী হামজা =< ইব্রাহিম নাখয়ী =< আলকামাহ ও আসওয়াদ =< আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ

، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عُلْقَمَةَ
وَالْأَسْوَدِ ، كَلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
، الْأَسْمَاءُ تَعَاذُ : - قَالَ : يُخْفِي الْإِمَامُ ثَلَاثًا
وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَأَمِينَ

উপরোক্ত হাদিসটি যঈফ। কারণ সানাদে রয়েছে "আবী হামজা মায়মূনা" তিনি মাতরুকুল হাদিস অর্থাৎ হাদিসের ক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য। ইনি মারাত্মক দুর্বল। এমন হাদিস যে, কিভাবে দলিল হিসেবে দেয়, তা আলগা হই ভালো জানেন। এছাড়া দলিল না পেয়ে অনেকে আলেড় আমিন বলার পক্ষে ইব্রাহিম নাখয়ীর "নিজস্ব" মন্ড্র্য দলিল হিসেবে দিয়েছেন যা খন্ডন করার কোনোই প্রয়োজন নাই। অর চুপে চুপে আমীন বলার কোনই দলীল নেই।

৫- ইমামের ভুল হলে মুক্তাদীদের সংকেত দেওয়াঃ

ইমামের ভুল হওয়া মানবীয় স্বভাব। তাই তার ভুল হলে মুক্তাদীগণ তার ভুলের সংকেত দিবে। যেন সে তার ভুল বুঝতে পারে ও তা শুধরে নেয়। যেমন ইমাম তিন রাকাত

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৩৪

বিশিষ্ট নামাযে যদি চার রাকাআতের জন্য উঠে কিংবা ৩ বা ৪ রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে প্রথম তাশাহহুদ শেষে বসে থাকে ইত্যাদি। এ সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “নামাযে কারো কিছু ঘটলে সে যেন তাসবীহ পড়ে (সুবহানাল্লাহ বলে)। কেননা যখন সুবহানালগ্গাহ বলা হবে, তখন সে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ দিবে। আর তালি দেয়া কেবল মহিলাদের জন্য”। [বুখারী, আযান অধ্যায়, নং ৬৮৪]

তবে ইমাম যদি ভুলে চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে পঞ্চম রাকাআতের জন্য উঠে দাঁড়ান কিংবা দুই রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে তৃতীয় রাকাআতের জন্য কিংবা তিন রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে চতুর্থ রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে যান আর পিছনে তাসবীহ বলার পরেও তিনি না ফিরেন এমতবস্থায় সেই মুক্তাদী কি করবে? কারণ, এটা নিশ্চিত যে তার ইমাম নির্ধারিত রাকাআতের অতিরিক্ত পড়াচ্ছেন।

এমন সময় সেই মুক্তাদী ইমামের সাথে অতিরিক্ত রাকায়াত আদায় না করে বসে তাশাহহুদের দুআ-যিকর পাঠ করবে এবং ইমাম যখন অতিরিক্ত রাকাআত শেষে সালাম ফিরাবেন, তখন সেও তাদের সাথে সালাম ফিরাবে। কারণ জেনে-বুঝে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত রাকাআত পড়লে নামায বাতিল হয়ে যাবে। [সউদী স্থায়ী ফতোয়া বোর্ড, ৭/১৩৭, ফতোয়া নং ৯৫২৬] এই ভাবে ইমাম যদি জানতে পারে যে, সে অতিরিক্ত রাকাআতের জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে কিংবা তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তার জন্য জরুরি যে, তিনি সেই রাকাআত না পড়ে বসে পড়বেন। [সউদী স্থায়ী ফতোয়া বোর্ড, ফতোয়া নং ১৭১৫৮]

৫- ইমামের ফাতিহা কিংবা অন্য কিরাআতে ভুল হলে স্মরণ করিয়ে দেওয়াঃ

ইমাম যদি কোন আয়াত ভুল পড়ে, তাহলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া বৈধ। [সউদী স্থায়ী ফতোয়া বোর্ড, ৬/৩৯৯] তবে বহু ইসলামী বিদ্বানের মতে ফাতেহার ক্ষেত্রে তা ওয়াজিব আর অন্য তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে তা মুস্তাহাব। [মাজমু, নবভী, ৪/২৩৯] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা নামায পড়ান এবং সেই নামাযে কিরাআতের সময় তাঁর জটিলতা সৃষ্টি হয়, নামায শেষে তিনি উবাই বিন কাআব (রাযিঃ) কে বললেনঃ তুমি আমাদের সাথে নামাযে ছিলে? সে বললঃ হ্যাঁ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তাহলে তোমাকে কি নিষেধ করলো? (অর্থাৎ স্মরণ করিয়ে দিতে কিসে বাধা দিল?) [আবু দাউদ, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ইমামকে লোকমা দেওয়া]

যে ব্যক্তি কোন খতীবকে বিভ্রান্ডির দিকে অথবা বিদআতের দিকে আহ্বান করতে শুনে সে কি করবেঃ

প্রশ্ন: আমাদের স্থানীয় ইমাম মানুষকে কতিপয় বিদআতের দিকে আহ্বান করেন। কিছু দ্বীনদার ভাই দলিল-প্রমাণসহ এ ব্যাপারে তাঁকে সাবধান করেছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত তিনি এ বিদআতগুলোর পক্ষে অটল অবস্থানে রয়েছেন। যদি জানা যায় যে, আজকের খোতবায়

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৩৫

খতীবসাহেব বিদআতের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবেন যেমন- মিলাদ, শবে বরাত, ইত্যাদি সেক্ষেত্রে আপনারা কি এ পরামর্শ দিবেন যে, সে ব্যক্তি জুমার খোতবা শুনতে যাবে না। কেউ যদি মসজিদে গিয়ে শুনতে পায় যে, খতীবসাহেব বিদআতের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করছেন তখন সে ব্যক্তির করণীয় কী? সে কী খোতবার মাঝখানে উঠে বাড়ীতে এসে যোহরের নামায আদায় করবে? অন্যথায় সে কী করবে? এ ধরনের খোতবা শুনায় হাজির থাকলে ব্যক্তি কি গুনাহগার হবে? কারণ কিছু ভাই নসিহত করার পরও খতীবসাহেব তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির উপর অটল অবস্থানে রয়েছেন। কেউ যদি খোতবার মধ্যে দুর্বল ও বানোয়াট হাদিস উল্লেখকরে তার ক্ষেত্রেও কি একই হুকুম প্রযোজ্য? আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

উত্তর: আলহামদুলিল্লাহ।

এক: যে ব্যক্তির এলাকার মসজিদে কোন বিদআতপন্থী ইমাম ইমামতি করেন: তার বিদআত হয়তো কুফরি বিদআত হবে অথবা সাধারণ কোন বিদআত হবে। যদি কুফরি বিদআত হয় তাহলে ঐ ইমামের পিছনে সাধারণ নামায কিংবা জুমার নামায কোনটা পড়া জায়েয হবে না। আর যদি ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় এমন কোন বিদআত না হয় তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী- তার পিছনে জুমা পড়া ও জামাতে নামায পড়া জায়েয। এ হুকুমটি এত বেশি প্রচার পেয়েছে যে, এটা এখন সুন্নাহ অনুসারীদের নিদর্শনে পরিণত হয়েছে। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী, যদি কেউ এমন ইমামের পিছনে নামায আদায় করে ফেলে তাহলে তাকে সে নামায শোধরাতে হবে না। এ বিষয়ক নীতি হচ্ছে- “যে ব্যক্তির নিজের নামায শুদ্ধ; সে ব্যক্তির ইমামতিও শুদ্ধ”।

আর যদি সেই বিদআতী ইমামকে বাদ দিয়ে অন্য কোন ইমামের পিছনে নামায পড়ার সুযোগ থাকে তাহলে সেটাই করতে হবে। বিশেষতঃ আলেম শ্রেণী ও তালিবুল ইলমকে সেটা করতে হবে। তা করা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ তুল্য। কিন্তু এ ইমামের পিছনে নামায বর্জন করতে গিয়ে ঘরে নামায পড়া জামাতযুক্ত নামাযের ক্ষেত্রে জায়েয নেই। সুতরাং জুমার ক্ষেত্রে জায়েয না হওয়া আরও বেশি যুক্তিযুক্ত।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: যদি মোক্তাদি জানে যে, ইমাম বিদআতি, বিদআতের দিকে আস্থান করে অথবা এমন ফাসেক (কবিরা-গুনাহগার) যার মধ্যে গুনাহর আলামত প্রকাশ্য এবং সেই-ই নির্ধারিত ইমাম; নামায পড়লে তার পিছনেই পড়তে হবে যেমন- জুমার ইমাম, ঈদের ইমাম, আরাফাতে হজ্জের নামাযের ইমাম ইত্যাদি এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আলেমের অভিমত হচ্ছে- মোক্তাদিকে তার পিছনেই নামায আদায় করতে হবে। এটি ইমাম আহমাদ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু হানিফা ও অন্যান্য আলেমের অভিমত।

এ কারণে আলেমগণ আকিদার কিতাবে লিখেন যে, ইমাম নেককার হোক কিংবা পাপাচারী হোক তিনি ইমামের পিছনে জুমার নামায ও ঈদের নামায আদায় করেন। অনুরূপভাবে এলাকাতে যদি শুধু একজন ইমাম থাকে তাহলে তার পিছনেই জামাতে নামাযগুলো আদায় করতে হবে। কেননা জামাতে নামায আদায় করা, একাকী নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম; এমনকি ইমাম ফাসেক (কবিরা-গুনাহগার) হলেও। এটি অধিকাংশ আলেম: আহমাদ ইবনে হাম্বল, শাফেয়ী ও অন্যান্যদের অভিমত। বরং ইমাম আহমাদের প্রকাশ্য অভিমত হচ্ছে- জামাতে নামায আদায় করা ফরজে আইন। ইমাম ফাসেক হওয়ার কারণে যে ব্যক্তি

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৩৬

জুমার নামায ও জামাতে নামায পড়ে না সে ইমাম আহমাদ ও আহলে সুন্নাহর অন্যান্য ইমামের মতে- বিদআতী; আব্দুস, ইবনে মালেক ও আব্তারের 'রিসালা' তে এভাবে এসেছে।

সঠিক মতানুযায়ী: সে ব্যক্তি নামায পড়ে নিবে; তাকে এ নামাযকে পুনরায় আদায় করতে হবে না। কারণ সাহাবায়ে কেরাম জুমার নামায, জামাতে নামায ফাসেক ইমামদের পিছনেও আদায় করেছেন; তাঁরা তাদের পিছনে আদায়কৃত নামায পুনরায় আদায় করতেন না। যেমন- ইবনে উমর হাজ্জাজের পিছনে নামায পড়তেন। ইবনে মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবী ওয়ালিদ ইবনে উকবার পিছনে নামায পড়তেন। ওয়ালিদ বিন উকবা মদ্যপ ছিল। একবার ফজরের নামায চার রাকাত পড়িয়েছে। এরপর বলল: আরো বাড়াব নাকি? তখন ইবনে মাসউদ বললেন: আজ তো আপনি বেশিই পড়িয়েছেন! এরপর তাঁরা তার বিরুদ্ধে ওসমান (রাঃ) এর নিকট অভিযোগ করেন।

সহিহ বুখারিতে এসেছে- ওসমান (রাঃ) যখন অবরুদ্ধ হলেন এবং জনৈক লোক এগিয়ে গিয়ে নামাযের ইমামতি করল তখন এক ব্যক্তি ওসমান (রাঃ) কে প্রশ্ন করল: নিঃসন্দেহে আপনি সর্বসাধারণের ইমাম। আর যে ব্যক্তি এগিয়ে এসে ইমামতি করল সে ফিতনার ইমাম। তখন ওসমান (রাঃ) বললেন: ভাতিষ্পুত্র শুন, নামায হচ্ছে- ব্যক্তির সবচেয়ে উত্তম কাজ। যদি লোকেরা ঠিকভাবে নামায আদায় করে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। আর যদি তারা মন্দ আচরণ করে তাদের সে মন্দ আচরণকে এড়িয়ে চল। এ ধরনের বাণী অনেক আছে।

ফাসেক বা বিদআতীর নামায সহিহ। অতএব, মোজাদি যদি তার পিছনে নামায পড়ে তাহলে তার নামায বাতিল হবে না। তবে, যারা বিদআতির পিছনে নামায পড়াকে মাকরুহ বলেছেন তারা দিক থেকে বলেছেন: সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ওয়াজিব। যে ব্যক্তি প্রকাশ্য বিদআত করে তাকে ইমাম হিসেবে নির্ধারণ না করাটা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের অশর্ড্ভর্ত। কেননা সে শাস্তিভোগ্য যতক্ষণ না তওবা করে। যদি তাকে এড়িয়ে চলা যায় যাতে করে সে তওবা করে সেটা ভাল। যদি কোন কোন লোক তার পিছনে নামায পড়া ছেড়ে দিলে, অন্যেরা নামায পড়লে সেটা তার উপরে প্রভাব ফেলে যাতে করে সে তওবা করে অথবা বরখাস্ত হয় অথবা মানুষ এ জাতীয় গুনাহ থেকে দূরে সরে আসে এবং সে মোজাদির জুমা বা জামাত ছুটে না যায় যদি এমন হয় তাহলে এ ধরনের লোকের তার পিছনে নামায বর্জন করাতে কল্যাণ আছে।

পক্ষাশ্ভুরে মোজাদির যদি জুমা ও জামাত ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে তার পিছনে নামায বর্জন করাটা বিদআত এবং সাহাবায়ে কেরামের আমলের পরিপন্থী। [আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (২/৩০৭-৩০৮)]।

দুই: ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে জানা যায় যে, যদি কেউ কোন খতীবকে বিদআতের দিকে ডাকে (যেমন যে বিদআতগুলোর কথা আপনি প্রশ্নে উল্লেখ করেছেন) অথবা বিদআতের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে অথবা দুর্বল ও বানোয়াট হাদিসগুলো উদ্ধৃত করতে শুনে তদুপরি তার জন্য মসজিদ ত্যাগ করা, খোতবা না-শুনা জায়েয হবে না। তবে যদি প্রভাবশালী আলেম হন এবং তিনি অন্য কোন খতীবের পিছনে নামায পড়বেন তাছাড়া ইতিপূর্বে ঐ খতীবকে নসিহত করেছেন, সত্যকে তার নিকট সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন- তিনি তার পিছনে নামায বর্জন করতে পারেন। যদি তিনি ইতিপূর্বে তাকে নসিহত না করে থাকেন অথবা অন্য কোন মসজিদে তার নামায পড়ার সুযোগ না থাকে তাহলে অগ্রগণ্য মত হচ্ছে- খোতবাকালে

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৩৭

মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়া জায়েয হবে না। তবে যদি এমন হয় যে, এ খতীবের পিছনে নামায পড়া জায়েয হবে না এমন পর্যায়ে তাহলে বেরিয়ে যেতে পারেন।

৬৩৬৬ নং প্রশ্নের জবাবে আমরা উল্লেখকরেছি জুমার নামাযের খতীব যদি কোন বিশাশিড়র কথা বলে অথবা কোন বিদআত সাব্যস্ত করে অথবা শিরকের দিকে আহ্বান করে আমরা সে প্রশ্নের জবাবে খোতবার মাঝখানে প্রতিবাদ করাকে বৈধ উল্লেখকরেছি। তবে শর্ত হচ্ছে- মানুষের মাঝে বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে পারবে না এবং জুমার নামায নষ্ট করা যাবে না। যে ব্যক্তি প্রতিবাদ করতে চায় তিনি খোতবা শেষে দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে খতীবের ভুল তুলে ধরবেন।

যে ব্যক্তি প্রতিবাদ করতে চায় তার উচিত সত্য তুলে ধরা ও সে খতীবের সমালোচনার ক্ষেত্রে কোমল হওয়া। যাতে করে মন্দের প্রতিবাদ ফলপ্রসূ হয়।

উল্লেখ্য কমিটির আলেমগণকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে-

যে খতীব তার খোতবার মাঝে অথবা গোটা খোতবা জুড়ে শুধু ইসরাইলী বর্ণনা ও দুর্বল হাদিস উল্লেখ করে এর মাধ্যমে মানুষকে চমকে দিতে চান ইসলামে এর হুকুম কী?

তাঁরা জবাবে বলেন: যদি আপনি সুনিশ্চিতভাবে (ইয়াকীনসহ) জানেন যে, খতীব খোতবার মধ্যে যে ইসরাইলী বর্ণনাগুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলো ভিত্তিহীন অথবা হাদিসগুলো দুর্বল তাহলে আপনি তাকে নসিহত করুন যেন অন্য সহিহ হাদিসগুলো উল্লেখকরে, আয়াতে কারীমাগুলো নিয়ে আসে। আর যে ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানেন না সেটাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে সম্পৃক্ত করবে না। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

“দ্বীন হচ্ছে- নসিহত”। হাদিসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহিহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

তবে নসিহত হতে হবে উত্তম পন্থায়; কর্কশ ও কঠিন আচরণের মাধ্যমে নয়। আল্লাহ আপনাকে তাওফিক দিন ও আপনাকে কল্যাণের ধারক বানান।

শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফিফি, শাইখ আব্দুল্লাহ গাদইয়ান। ফাতাওয়াল লাজনাহ দায়িমা (৮/২২৯-২৩০)

সার কথা হচ্ছে- যদি আপনি এমন কোন মসজিদে যেতে পারেন যেখানে বিদআত নেই, যে মসজিদের খতীব বিদআতের দিকে আহ্বান করে না সেটা ভাল। যদি না যেতে পারেন অথবা আপনাদের নিকটে অন্য কোন মসজিদ না থাকে তাহলে উল্লেখিত কারণে জামাত ও জুমা ত্যাগ করা আপনাদের জন্য জায়েয হবে না। আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে- নসিহত করা ও আল্লাহরদিকে আহ্বান করা। দাওয়াতের ভাষা যেন কোমল হয় এবং পদ্ধতি যেন সুন্দর হয় সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা। আল্লাহই ভাল জানেন।

৬- মুক্তাদীদের ভুল-ত্রুটিঃ

প্রথম কাতার কিংবা সামনের কাতার পুরোন না করেই আলাদা কাতার বানানো। [সহীহ ইবনু মাজাহ, নং ৮১৪]

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৩৮

প্রথমকাতারে দাঁড়াতে অলসতা করা। অথচ প্রথম কাতারের ফযীলত জানলে তারা পরস্পরে লটারি করতে হলেও করতো। [বুখারী, নং ২৫৪৩]

কাতার সোজা না করা বরং বাঁকা থাকা সত্ত্বেও নামায শুরু করে দেওয়া। [মুসলিম নং ৪৩২]

বিনা ওজরে একাই এক কাতারে নামায আদায় করা। (এ সম্পর্কে বিস্ফুরিত আলোচনা আগামীতে আসবে, ইনশাআল্লাহ)

(একান্ড প্রয়োজন ছাড়া) খুঁটি তথা পিলারের মাঝে কাতার তৈরি করা; অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা নিষেধ করেছেন। [সহীহ ইবনে মাজাহ, নং ৮২১]

নামাযের কাজগুলি ইমামের পূর্বে কিংবা তার সাথে সাথে করা। ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে)

ইমামের পিছনে জ্ঞানী ও বড়দের অবস্থান না করা; অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “তোমাদের জ্ঞানবান ও সাবালোকরা যেন আমার নিকটে থাকে, অতঃপর তার পরের স্ভরের লোকেরা, অতঃপর তার পরের স্ভরের লোকেরা”। [মুসলিম, নং ৯৭৩]

মাসবূকের বিধান:

১-মাসবূক কাকে বলে? আলোচ্য বিষয়ে মাসবূক বলতে আমরা সেই নামাযী ব্যক্তিকে বুঝাতে চাচ্ছি, যার ইমাম তার পূর্বে এক বা একাধিক রাকাতাত কিংবা নামাযের কিছু অংশ সমাপ্ত করেছে আর সে নামায শুরু হওয়ার পর জামাআতে প্রবেশ করেছে।

২-মাসবূক কিভাবে নামাযে আসবে?

নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে বা অন্য কোনো স্থানে আগমন করার সময় যদি নামাযীর যথাস্থানে পৌঁছানোর পূর্বে জামাআত দাঁড়িয়ে যায় কিংবা জামাআত দাঁড়ানোর পর সে যদি সেই জামাআতে শরীক হতে চায়, তাহলে সে যেন ধীর-স্থির অবলম্বন করতঃ জামাআতে যায়, দৌড়া-দৌড়ি বা তাড়াহুড়া না করে।

নবী (সাঃ) বলেনঃ

”افم تَسْرِعُوا، ولا والوقارِ، بالسكينة عليكم و الصلاة إلى فامشوا الإقامة سمعتم إذا متفق عليه“ ”فَاتَمُّوا فَاتَكُم وَمَا فَصَلُوا، أَدْرَكْتُمْ

“যখন তোমরা ইকামত শুনবে, তখন তোমরা শান্ত ও স্থৈর্য সহকারে নামাযে চলো, দ্রুত চলো না। যা পাবে তা পড়ে নিবে আর যা ছুটে যাবে তা পূরণ করে নিবে”। [বুখারী, আযান অধ্যায়, নং ৬৩৬/মুসলিম, মাসাজিদ, নং ১৩৫৯]

মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, “কারণ তোমাদের কেউ যখন নামাযের ইচ্ছা করে, তখন সে নামাযেই থাকে”।

তাই নামাযে যে ভাবে ধীর-স্থির অবলম্বন করতে হয়, সে অবস্থা যেন নামাযে আসার সময়ও থাকে। তাছাড়া দৌড়ে বা দ্রুত আসলে মানুষ হাঁপায় এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না, যার ফলে তার নামাযের খুশ-খুশুতে ব্যাঘাত ঘটে।

৩-মাসবূক যে কোনো নফল না পড়ে অতি সত্তর জামাআতে শরীক হবেঃ

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৩৯

নামাযী যদি এমন সময় মসজিদে প্রবেশ করে যে, জামাআত দাঁড়িয়ে গেছে, তাহলে সে সুল্লাতে মুআক্কাদা বা তাহিয়্যাতুল মসজিদ কিংবা অন্য কোন নামায শুরু করবে না; বরং সরাসরি ফরয জামাআতে শরীক হবে। নবী (সাঃ) বলেনঃ “যখন নামাযের ইকামত দেওয়া হবে, তখন ফরয নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায নেই”। [মুসলিম, সালাতুল মুসাফেরীন, নং ১৬৪৪]

৪-মাসবুক ব্যক্তির সামনের কাতারে স্থান না পেলে পিছনে একাই দাঁড়ানো:

মাসবুক মসজিদে প্রবেশ করার পর যদি দেখে যে, সামনের কাতারে খালি স্থান নেই, তাহলে সে কি সামনের কাতার থেকে কাউকে টেনে নিয়ে কাতার তৈরি করবে, না ইমামের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে, না অন্য কারো আসার অপেক্ষা করবে, যেন তার সাথে মিলে দু জনে কাতার তৈরি করে, না একা একা পিছনে দাঁড়াবে?

এ বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মতভেদ বিদ্যমান। এক দল ইসলামী পণ্ডিত মনে করেন, লাইনের পিছনে একা একা এক লাইনে নামায পড়লে নামায হবে না। কারণ নবী (সাঃ) বলেনঃ “লাইনের পিছনে একা নামায আদায়কারীর নামায হয় না” [আহমদ, ৪/২৩ ইবনু মাজাহ, অধ্যায় ইকামাতুস স্বালাত, নং ১০০৩]

অন্য হাদীসে এসেছে, একদা নবী (সাঃ) এক ব্যক্তিকে লাইনের পিছনে একা নামায পড়তে দেখলে তাকে পুনরায় নামায আদায় করার আদেশ দেন। [আহমদ, তিরিমিযী, আবওয়াবুস স্বালাত, নং ২৩০, আবু দাউদ, স্বালাত অধ্যায়, নং ৬৮২, সহীহ সুনান আবু দাউদ, আলবানী, নং ৬৩৩]

যদি লাইনের পিছনে একা নামায পড়া শুদ্ধ হত, তো নবী (সাঃ) তাকে পুনরায় আদায় করার আদেশ করতেন না। তাছাড়া উপরোক্ত দলীলকে শিথিলকারী কোন অন্য দলীলও পাওয়া যায় না। এসব কারণে উলামাগণের একটি দল লাইনের পিছনে একা নামায আদায়কারীর নামায বাতিল মনে করেন।

ইসলামী পণ্ডিতগণের অপর দলটি ওজর বশতঃ লাইনের পিছনে একা নামায পাঠকারীর নামায শুদ্ধ মনে করেন, বিনা ওজরে নয়। ওজরের ব্যাখ্যা এইরূপ যে, নামাযী মসজিদে প্রবেশ করার পর যখন দেখে যে, সামনের লাইনে তার জন্য কোন স্থান নেই, তখন পিছনে একা নামায পড়া ছাড়া আর তার কোন উপায় থাকে না। তাই এই অবস্থায় তার পিছনে একা নামায পাঠ করাটা একটি ওজর। তারা মনে করেন, লাইনের পিছনে একা ব্যক্তির নামায শুদ্ধ না হওয়াটা নামাযীর লাইনবদ্ধ হওয়া জরুরীর প্রমাণ। কিন্তু সে কাতারবদ্ধ হতে অপারগ কারণ; সামনের কাতারে জায়গা নেই। তাই এমতাবস্থায় তার জন্য এই শারয়ী মূলনীতি প্রযোজ্য যে, [লা-ওয়াজিবা মাআ'ল ইজ্ য়] অপারগ হলে ওয়াজিবের বিধান প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ কেউ কোন কিছু করতে অক্ষম হলে, তা করাটা তার উপর জরুরী থাকে না। আল্লাহতাআলা বলেনঃ (কাজেই তোমরা আলগা হকে তোমাদের সাধ্যমত ভয় কর।) [আত তাগাবুন/১৬] তিনি আরো বলেনঃ (আলগা হ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না।) [বাকারাহ/২৮৬] এই মতটি মধ্যম মত হিসাবে শাইখুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া, শাইখ সাদী, শাইখ

আলবানী, শাইখ ইবনে উসায়মীন প্রমুখ গ্রহণ করেছেন। এই বিষয়ের সারাংশ স্বরূপ উল্লেখ্য যে,

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৪০

ক-মাসবুক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করার পর নিজে একা কাতার তৈরি না করে সামনের লাইনে ঢুকান চেষ্টা করবে। এই সময় মুসল্লীদের তার জন্য স্থান করে দেওয়া উচিত। নবী (সাঃ) বলেনঃ “তোমরা কাতার সোজা করে নাও, কাঁধ বরাবর করে নাও, খালি স্থানগুলি পূরণ করে নাও এবং নিজ ভায়ের হাত ধরার ক্ষেত্রে নম্র হও..”। [আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, সহীহত তারগীব ওয়াত তারহীব]

আবু দাউদ (রহঃ) নিজ ভাইর হাত ধরার ক্ষেত্রে নম্র হও এর অর্থে বলেনঃ “যখন কেউ লাইনে প্রবেশ করতে আসে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত যে, তারা যেন তার জন্য নিজ কাঁধ নম্র করে যেন সে লাইনে প্রবেশ করতে পারে।

খ- এই সময় কাউকে সামনের কাতার থেকে টেনে নিয়ে কাতার তৈরি করা যাবে না। কারণ এমন করার কোন সহীহ দলীল নেই। বরং এতে কিছু শারঈ বিধান লঙ্ঘিত হয় যেমনঃ

১-যাকে টানা হয়, তাকে সমস্যায় ফেলা হয় এবং তার খুশ-খুশুতে ব্যাঘাত ঘটে।

২-পূর্ণ লাইনে খালি স্থান তৈরি করা হয়; অথচ লাইন পূরণ ও মিলনের আদেশ করা হয়েছে।

৩-যাকে টানা হচ্ছে তাকে উত্তম ফযীলতের স্থান থেকে কম মানের স্থানে স্থানান্তর করা হয়।

৪-পুরা লাইনে ব্যাঘাত ঘটে কারণ; এক জনের স্থান খালি হওয়ার কারণে লাইনের সবাইকে তা পূরণের জন্য নড়া-চড়া করতে হয়। [শারহুল মুমতি, ইবনে উসায়মীন, ৪/২৭২-২৭৩]

গ-সে ইমামের পাশে গিয়ে তার বরাবর দাঁড়িয়ে নামায পড়বে না কারণঃ

১-এতে মানুষের কাঁধ ডিঙ্গানোর প্রয়োজন রয়েছে; অথচ নামাযীর কাঁধ ডিঙ্গানো নিষেধ।

২-ইমামের সাথে তাঁর বরাবর নামায পড়লে সুন্নতের বরখেলাফ করা হয় কারণ; সুন্নত হচ্ছে ইমামের স্থান মুক্তাদীর স্থান থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র। [প্রাগুক্ত ৪/২৭৩]

ঘ-মাসবুক সামনের লাইনে ফাঁকা স্থান না পেলে এবং তাতে প্রবেশ না করতে পারলে, সে আর অন্য মাসবুকের অপেক্ষা করবে না; বরং একাই পিছনের লাইনে নামায পড়বে কারণঃ

১-অপেক্ষা করতে করতে রাকাতাত ছুটে যেতে পারে আর অনেক সময় সেটি শেষ রাকাতাত হলে জামাতাতই ছুটে যেতে পারে। আর এমন হলে জামাতাতের ফযীলত থেকে সে মাহরুম হয়ে যাবে আর নামাযও ছুটে যাবে। [প্রাগুক্ত, ৪/২৭৪]

৫-মাসবুক কি ভাবে এবং কি বলে জামাতাতে প্রবেশ করবে?

মাসবুক ব্যক্তি প্রথমে দন্ডয়মান অবস্থায় তকবীরে তাহরীমা দিবে অতঃপর ইমামকে যেই অবস্থায় পাবে, সেও সেই অবস্থায় চলে যাবে কারণ; তকবীরে তাহরীমা নামাযের রুকুন তাই তা ব্যতীত নামায হয় না। অনেক সময় এই অবস্থায় মাসবুকের উপর দুটি তাকবীর একত্রিত হয়ে যায়। যেমন ধরুন মাসবুক এমতাবস্থায় জামাতাতে প্রবেশ করছে, যখন ইমাম রুকু বা সাজদার জন্য তাকবীর দিচ্ছেন। এই সময় মাসবুকের প্রতি প্রথমে তাকবীরে তাহরীমা

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৪১

দেওয়া জরুরী অতঃপর রুকূর বা সাজদার তাকবীর দেওয়া। এটি উত্তম নিয়ম তবে যদি কেউ রুকূ বা সাজদার তাকবীর, যাকে তাকবীরাতুল ইশ্দিফতাহ বলা হয় তা না দিয়ে শুধু তাকবীরে তাহরীমা দেয়, তাহলে তার জন্য এটিই যথেষ্ট হবে।

[আল্ মুলাখ্বাস আল্ ফিকহী, ড.সালেহ ফাউয়ান, পৃঃ ৯৮]

অতঃপর ইমাম যেই অবস্থায় থাকবে সেও সেই অবস্থায় শরীক হবে। ইমাম সাজদায় আছে বলে তাঁর সাজদা থেকে দাঁড়ানোর অপেক্ষা করা বা আরো এইরূপ অন্য কিছুই অপেক্ষা করা ভুল। নবী (সাঃ) বলেনঃ “যখন তোমাদের কেউ নামাযে আসবে এমতাবস্থায় যে ইমাম কোন এক অবস্থায় আছেন, তাহলে সে যেন তেমন করে যেমন ইমাম করেন।” [তিরমিযী, অনুচ্ছেদ নং ৬২ হাদীস নং ৫৯১, শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন] তিনি (সাঃ) আরো বলেনঃ “যখন তোমরা ইমামকে সাজদারত অবস্থায় পাবে, তখন তোমরাও সাজদা করবে কিংবা রুকূ অবস্থায় পাবে, তখন তোমরাও রুকূ করবে কিংবা কিয়াম অবস্থায় পাবে, তখন তোমরাও দাঁড়াবে।” [সিলসিলা সহীহা নং ১১৮৮]

৬-মাসবুক দুআই ইশ্দিফতাহ (সানা) পড়বে কি?

দুআয়ে ইশ্দিফতাহ বা সানা পড়ার সময় হচ্ছে, তাকবীরে তাহরীমার পর এবং সূরা ফাতিহা পড়ার পূর্বে। তাই মাসবুক যদি ইমামের রুকূ, সিজদা বা তাশাহ্ হুদের সময় জামাআতে শরীক হয়, তাহলে তাকে সানা পড়তে হবে না। কারণ এগুলো সানা পড়ার স্থান নয় এবং এসব স্থানের দুআ ও যিকির নির্দিষ্ট। কিন্তু মাসবুক যদি কিয়াম অবস্থায় ইমামকে পায় আর তার অধিক ধারণা হয় যে, সে ইমামের রুকূ করার পূর্বে সানা পড়ে সূরা ফাতিহা পড়তে পারবে, তাহলে সে সানা পড়বে; নচেৎ শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে। কারণ সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব আর সানা পড়া মুস্তাহাব। এটাই প্রাধান্যযোগ্য মত। ইমাম নবভী (রহঃ) বলেনঃ “মাসবুক ইমামকে যদি কিয়াম ছাড়া অন্য অবস্থায় পায়, তাহলে দুআয়ে ইশ্দিফতাহ (সানা) পড়বে না, আর যদি কিয়াম অবস্থায় পায় এবং অনুমান করতে পারে যে, সে সানা, তাআউয (আউযুবিলিগ্গাহ) ও ফাতিহা পড়তে পারবে, তাহলে সানা পড়বে আর যদি বুঝতে পারে যে, এসব পড়া সম্ভব নয় কিংবা সন্দেহ হয়, তাহলে সানা পড়বে না”।

[মাজমু ৩/৩১৮-৩১৯]

এ সম্পর্কে কিছু উলামা মনে করেন, সিরী (নিরব) নামাযে মাসবুকসানা পড়বে কিন্তু জাহরী (সশব্দিক) নামাযে যদি ইমামকে সূরা ফাতিহাপড়ার পূর্বে নিরব অবস্থায় পায়, তাহলে পড়বে নচেৎ পড়বে না।

৭-মাসবুক ইমামের সাথে যেই রাকাআতে প্রবেশ করে, তা কি তার জন্য প্রথম রাকাআত?

অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরাম মনে করেন, মাসবুক যখন জামাআতে শরীক হয়, তখন তার সেটা নামাযের শেষাংশ হয়। আর যখন সে বাকিটা পূরণ করে সেটা তার প্রথমাংশ হয়। [ফিকহ বিশ্বকোষ ৩৭/১৬৪] উদাহরণ স্বরূপ যদি কোনো ব্যক্তি এমন সময় জামাআতে শরীক হয়, যখন ইমাম এক রাকাআত শেষ করে দ্বিতীয় রাকাআত পড়ছেন, তখন মাসবুকের এই রাকাআতটি তার জন্য প্রথম না দ্বিতীয়? হানাফী, মালেকী ও হামালী

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৪২

ফুকাহাগণ এটাকে তার জন্য দ্বিতীয় রাকাত মনে করেন, যেমন সেটা ইমামের জন্যও দ্বিতীয়। আর ইমামের সালাম ফিরানোর পর সে যা পড়বে তা তার প্রথম রাকাত বা নামাযের শেষাংশ ধরা হবে। তাদের দলীল নবী (সাঃ) এর এই হাদীস “যা পাবে তা পড়ে নিবে আর যা ছুটে যাবে তা কাযা করে নিবে”। [নাসাঈ, ইমামাহ অধ্যায়, নং ৮৬০] তারা এখানে কাযা শব্দটিকে ফেকহী পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ কোন আমল তার নির্ধারিত সময়ে না করা হলে পরে তা করে দেওয়া। তাই ইমামের সাথে যেটা মাসবুক পায় নি সেটা তার প্রথম নামায ছিল যা নির্ধারিত সময়ে আদায় না হওয়ার কারণে পরে সে তা কাযা হিসাবে সম্পাদন করবে।

তবে শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহগণ মনে করেন, মাসবুক জামাআতে শরীক হয়ে ইমামের সাথে নামাযের যে প্রথম অংশটি পায় সেটা তার জন্য প্রথম রাকাত এবং পরে সে যা পূরণ করে সেটি তার শেষ নামায বা নামাযের শেষাংশ। কারণ নবী (সাঃ) বলেনঃ “যখন নামাযে আসবে, তখন শাম্‌ড় ভাবে আসবে, যা পাবে তা পড়ে নিবে আর যা ছুটে যাবে, তা পূরণ করে নিবে”। [বুখারী, অধ্যায়, আযান নং ৬৩৫, ৬৩৬, মুসলিম, মাসাজিদ অধ্যায়, নং ১৩৬২]

এটিই অগাধিকারপ্রাপ্ত মত কারণঃ

ক-নবী (সাঃ) এর বাণী ‘পূরণ করে নিবে’ থেকে বুঝা যায় যে, মুক্তাদী ইমামের সাথে যা পায় তা তার প্রথম রাকাত। কারণ কোনো কিছু তখনই পূরণ হয়, যখন তা শুরু করা হয়। তাই নবী (সাঃ) যখন ছুটে যাওয়া নামায পূরণ করতে বলছেন, তখন এর অর্থ দাঁড়ায় যে, সে ইমামের সাথে যা পেয়েছে, তা তার প্রথম নামায।

খ-ইবনু মুনযির বলেনঃ তারা এ ব্যাপারে ঐক্যমত যে, তাকবীরে তাহরীমা প্রথম রাকাত ছাড়া অন্য রাকাতে হয় না। [নায়লুল আউত্বার, ৩/১৭১] তাঁর মশ্‌ভুবের ব্যাখ্যা এইরূপ যে, মাসবুক যখন তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে নামাযে প্রবেশ করে, তখন তার সেটা প্রথম রাকাত হওয়াই সঙ্গত কারণ; তাকবীরে তাহরীমা প্রথম রাকাতাতেই হয়। এমন নয় যে, মাসবুক যখন দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাকাতাতে প্রবেশ করে, তখন সে তাকবীরে তাহরীমা দিবে না বরং যখন পূরণ করতে উঠবে তখন তাকবীরে তাহরীমা দিবে।

গ-বাকি থাকলো সেই বর্ণনা, যাতে কাযা করার শব্দ এসেছে তো তার উত্তর এই ভাবে দেওয়া হয়েছে।

১-কাযা করার বর্ণনা অপেক্ষা পূরণ করার বর্ণনা বেশী সংখ্যায় এসেছে এবং তা বেশী শুদ্ধ কারণ; এই বর্ণনা সহীহাইনে এসেছে।

২-হাদীসে কাযা শব্দটি ফুকাহাগণের পরিভাষায় ব্যবহার হয়নি কারণ তা পরে আবিষ্কৃত পরিভাষা; বরং তা কোনো কাজ পূরণ করা বা সমাপ্ত করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনআল্লাহতাআলা বলেনঃ (ফা-ইয়া কুযিয়াতিস্ স্বালাতু) [জুমুআহ/১০] অর্থঃ (যখন নামায সমাপ্ত হবে) তিনি অন্যত্র বলেনঃ (ফা-ইয়া কাযাইতুম মানাসিকাকুম) [বাকারাহ/২০০] অর্থঃ (অতঃপর হজ্জের কার্যাবলী যখন সমাপ্ত করবে)

এই মতভেদের ফলাফলঃ ধরুন যদি কেউ ইমামের সাথে মাগরিবের তৃতীয় রাকাতাতে শরীক হয়, তাহলে প্রথম মতানুযায়ী সে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করবে কারণ; এটা তার তৃতীয় রাকাতাত যেমন ইমামের ক্ষেত্রেও তৃতীয় রাকাতাত। কিন্তু দ্বিতীয় মতানুযায়ী সে সূরা ফাতিহা সহ অন্য একটি সূরাও পাঠ করবে কারণ; এটি তার প্রথম রাকাতাত।

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৪৩

এই ভাবে বাকি বিষয়গুলি অনুমান করতে পারেন।

৮-রুকু পেলো রাকাআত গণ্য করাঃ

মাসবুক ইমামের সাথে রুকু পেলো সে সেই রাকাআতটি গণ্য করবে কি করবে না? অর্থাৎ তার সে রাকাআতটি হয়ে যাবে না হবে না? এ বিষয়ে ইসলামী বিদ্বানদের দুটি মত দেখা যায়।

প্রথম মতঃ তার রাকাআত হয়ে যাবে এবং সে এটি রাকাআত ধরে নিবে। এই মতে সমস্ত ফুকাহদের ঐক্যমত রয়েছে। [ফিকহ বিশ্বকোষ ৩৭/১৬৩] তাদের দলীলাদি নিম্নরূপঃ

১-আবু বাকরা থেকে বর্ণিত, তিনি একদা লাইনে পৌঁছানোর পূর্বে রুকু করেন এবং ঝুকেই লাইনে প্রবেশ করেন। বিষয়টি নবী (সাঃ) কে বলা হলে তিনি (সাঃ) বলেনঃ “আল্লাহতোমার আগ্রহকে বাড়িয়ে দিক আর পুনরায় এমন করো না”। [বুখারী, আযান অধ্যায়, নং ৭৮৩] তারা বলেনঃ নবী (সাঃ) তাকে সেই রাকাআতটি পুনরায় পড়ার আদেশ দেন নি, যা দ্বারা বুঝা যায় রুকু পেলো রাকাআত হয়ে যায়।

‘পুনরায় করো না’ এর অর্থে ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহ) বলেনঃ দৌড়ে চলা এবং লাইনে প্রবেশের পূর্বে রুকু করা অতঃপর সেই অবস্থায় ঝুকে হেঁটে লাইনে প্রবেশ করা, এমন কাজ আর করো না। তিনি ত্বাবারানীর বরাতে একথাও উল্লেখ করেন যে, নবী (সাঃ) জিজ্ঞাসা করেনঃ এই নিঃশ্বাসী ব্যক্তি কে? (দৌড়ে দূর থেকে রুকু করার কারণে তাঁর নিঃশ্বাস স্তব্ধ হয়ে গেছিল) তখন তিনি বলেনঃ আমার ভয় হচ্ছিল যে, আপনার সাথে রাকাআতটি পাব না”। [ফাতহুল বারী ২/৩৪৭] অর্থাৎ রাকাআতটি যেন ছুটে না যায় তাই তিনি এমন করেছিলে, যা থেকেও ইঙ্গিত মিলে যে, রুকু পেলো রাকাআত হয়ে যায়। অনেকে বলেনঃ পুনরায় করো না, মানে লাইনের বাইরে তাকবীরে তাহরীমা দেওয়ার কাজটি আর করো না। কেউ বলেনঃ নামাযে আসতে ঢিলেমি করো না। রুকু অবস্থায় হেঁটে লাইনে প্রবেশ করো না কারণ; এটি চতুষ্পদ জন্তুর চলন। [নায়লুল আউত্বার, শাওকানী, ৩/২৩৬] রুকু পেলো রাকাআত হয়ে যায়, মত পোষণকারীগণ উপরোক্ত অর্থগুলি থেকেও দলীল পেশ করে বলেনঃ কোনো অত্থেদ মাধ্যমে এটা বুঝা যায় না যে, নবী (সাঃ) তাকে পুনরায় সেই রাকাআতটি পড়তে বলেছেন, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, রুকু পেলো রাকাআত হয়ে যায়।

২-নবী (সাঃ) বলেনঃ “যে নামাযের এক রাকাআত পেল, সে নামায পেয়ে গেল”। [বুখারী, মাওয়াক্বীতুস স্বালাত, নং ৫৮০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, যখন তোমরা নামাযে আসবে আর আমরা সাজদায় থকবো তখন তোমরাও সাজদা করো এবং তা গণ্য করো না। আর যে ব্যক্তি রাকা আত পেলো সে নামায পেয়ে গেল”। [আবু দাউদ, বায়হাক্বী, আলবানী (রহ) যযীফ বলেছেন, ইরওয়া ২/২৬০]

আপত্তিঃ হাদীস থেকে রুকু পেলো নামায পেলো, বা নামাযের ফযীলত পেলো, এটা বুঝা যায় কিন্তু রাকাআত পেলো তা বুঝা যায় না কারণ; তা উল্লেখ হয়নি।

উল্লেখ্য, (যে রুকু পেল সে রাকাআত পেয়ে গেল) বলে আবু দাউদের বরাতে যেই হাদীসটি বর্ণনা করা হয়, তা বর্তমান অনেক গবেষকের নিকট সাব্যস্ত নয়; যদিও বহু ফিকহ তথা অন্যান্য গ্রন্থে এমনই উল্লেখহয়েছে। [দেখুন, সালেহ বিন মুহাম্মদ আল্ আম্বদী কর্তৃক লিখিত

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৪৪

প্রবন্ধ ‘তাহকীকুল খিলাফ ফী হাদীসে মান আদ’ রাকার রুকু ফায্বাদ আদ রাকার রাকাআহ’ [III.সখলযবং,খষশখয,হবঃ এ প্রকাশিত]

৩-তাঁরা এছাড়া আরো কিছু সাহাবার আমল দ্বারা দলীল দিয়েছেন কিন্তু এসব বর্ণনা দোষ মুক্ত নয়।

দ্বিতীয় মতঃ রুকু পৈলে রাকাআত হবে না; বরং তাকে রুকুর পূর্বে কিয়াম অবস্থায় সূরা ফাতিহা পড়ার সুযোগ থাকতে হবে। এটি ইবনু হাযম সহ অনেকের মত [আল্ মুহাল্লা, ইবনু হাযম ৩/২৪৪]

এই মতের দলীলাদিঃ

১-নবী (সাঃ) বলেনঃ “ যা পাবে তা পড়ে নিবে আর যা ছুটে যাবে তা পূরণ করে নিবে” [বুখারী, অধ্যায়, আযান নং ৬৩৫, ৬৩৬, মুসলিম, মাসাজিদ অধ্যায়, নং ১৩৬২] যে ইমামকে রুকু অবস্থায় পায়, তার কিয়াম ছুটে যায়। তাই তাকে সালামের পর সেটা পূরণ করতে হবে।

২-কিয়াম নামাযের রুকন, যা ব্যতীত নামায হয় না। নবী (সাঃ) বলেনঃ “দাঁড়িয়ে নামায পড়, যদি না পারো তো বসে পড়, তাও না পারলে কাঁত হয়ে পড়”। [বুখারী, তাকসীরুস স্বালাত, নং ১১১৭]

বুঝা গেল, নামাযে দাঁড়ানো জরুরী তা বিনা ওজরে ছাড়া যাবে না। তাই রুকু পাওয়া ব্যক্তির কিয়াম ছুটে যায় বলে তাকে সেই রাকাআত আবারো পড়তে হবে।

৩-নবী (সাঃ) বলেনঃ “ সূরা ফাতিহা পড়া ব্যতীত নামায হয় না”। [বুখারী, আযান অধ্যায়, নং ৭৫৬]

বুঝা গেল, সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায হয় না। তাই রুকু পাওয়া ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়েনি বলে তাকে পরে তা কাযা করতে হবে।

অগাধিকার প্রাপ্ত মত নির্ণয়ঃ প্রথম মতের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে, ইমাম চতুষ্ঠয় সহ জমহুর উলামা আবু বাকরা (রাযিঃ) এর হাদীস থেকে রুকু পৈলে রাকাআত হয়ে যায় বুঝেছেন এবং এটি সউদী ছাযী উলামা পরিষদও সমর্থন করেছেন। তাই তাঁদের বুঝের বিপরীতে কোন রায় দেওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর। অন্য দিকে নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ এবং কিয়ামের গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করলে রুকু পাওয়া ব্যক্তির রাকাআত হওয়া মেনে নেওয়াতে একটু কিন্তু থেকেই যায়। তবে উভয় মত দলীল দ্বারা সমাদৃত হওয়ায় দুটির প্রতি আমল করা সঙ্গত হবে ইনশা আল্লাহ।

৯-জুমআর এক রাকাআত নামায ছুটে গেলেঃ

যে ব্যক্তি জুমআর এক রাকাআত নামায পেয়েছে, সে জুমআ পেয়েছে। এই সময় সে ইমামের সালামের পর বাকি এক রাকাআত পূরণ করে নিবে। নবী (সাঃ) বলেনঃ “ যে ব্যক্তি জুমআর এক রাকাআত পেল, সে যেন আর এক রাকাআত মিলিয়ে নেয় এবং তার সালাত

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৪৫

পূর্ণ”। [নাসাঈ নং ৫৫৭, ইবনু মাজাহ নং ১১২১, সূত্র সহীহ, ফাতাওয়া লাজনা দাইমাহ ৮/২২৪]

আর যে ব্যক্তি এক রাকাআতের কম পেয়েছে, যেমন দ্বিতীয় রাকাআতের সাজদা বা তাশাহ্‌হুদ পেয়েছে, তাহলে সে জুমআর সালাত পায় নি। এমতাবস্থায় সে ইমামের সালাম শেষে উঠে চার রাকাআত যহরের নামায আদায় করবে। [সউদী স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ড ৮/২২৭]

১০-ঈদের নামাযের মাসবুকঃ

ঈদের নামাযে প্রথম রাকাআতে ইমামের অতিরিক্ত তকবীর দেওয়ার সময় কেউ জামাআতে প্রবেশ করলে, প্রথমে সে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে নামাযে প্রবেশ করবে। এই সময় যদি সে কিছু তকবীর ইমামের সাথে পায় তো দিবে নচেৎ বাকি কাজে ইমামের অনুসরণ করবে। নামায শেষে এই অতিরিক্ত তাকবীর (তাকবীরে যাওয়াঈদ) তাকে পূরণ করতে হবে না। [মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনু উসায়মীন, ১৬/২৪৫]

আর কেউ যদি দুই ঈদের দ্বিতীয় রাকাআতের তাশাহ্‌হুদে শরীক হয়, তাহলে সে ইমামের সালাম ফিরানোর পর ইমামের মতই তকবীর, কিরাআত, রুকু ও সাজদা করে দুই রাকাআত নামায আদায় করবে। [সউদী স্থায়ী ফতোয়া বোর্ড ৮/৩০৭] এই ভাবে এক রাকাআত ছুটে গেলেও অনুকূপ পদ্ধতিতে আদায় করবে।

১১-জানাযার নামাযের মাসবুকঃ

যদি কেউ এমন অবস্থায় জানাযার নামাযে শরীক হয় যখন ইমাম একটি তাকবীর শেষ করে দ্বিতীয় তাকবীরে আছেন বা দ্বিতীয় শেষ করে তৃতীয়তে অবস্থান করছেন বা তৃতীয় শেষ করে চতুর্থের স্থানে রয়েছেন। তাহলে সে ইমামের সাথে যত তাকবীর পাবে তার অনুসরণ করতঃ আদায় করবে এবং ইমামের সালাম ফিরানোর পর এবং জানাযা উঠানোর পূর্বে সে বাকি তাকবীরগুলি দিয়ে সালাম ফিরাবে। কাযা তকবীরগুলি আদায় করার সময় তার উপর সর্বনিম্ন যা জরুরী তা করলেই যথেষ্ট হবে। যেমন দ্বিতীয় তাকবীরে যদি বলে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আঁলা মুহাম্মদ (হে আল্লাহ! নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করো) এবং তৃতীয়ের পর যদি বলেঃ ‘আল্লাহুম্মাগ্ ফির লাহ্’ (হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করো), তাহলে তা যথেষ্ট হবে। [সউদী স্থায়ী ফতোয়া বোর্ড, ৮/৩৯৯]

‘সাহ্’ ও সাজদায়ে সাহ্ঃ

সাহ্‌র আভিধানিক অর্থ, ভুল, অমনোযোগ এবং বেখেয়াল। তাই নামাযে সাহ্‌ হওয়া মানে নামায সম্পাদনের সময় ভুলে তথা বেখায়ালে কিছু ছেড়ে দেওয়া বা বেশী করে দেওয়া বা সন্দেহে পড়া। আর সাজদায়ে সাহ্‌ হচ্ছে, সেই ভুল সংশোধনের উদ্দেশ্যে সালাম ফিরানোর পূর্বে বা পরে দুটি সাজদা করা।

১-সাজদায়ে সাহ্‌র মাধ্যমে কি ধরণের ভুল সংশোধিত হয়?

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৪৬

নামাযে সংঘটিত ভুলগুলি সমমানের নয়। কিছু ভুল বড় পর্যায়ে, যা সাজদায়ে সাহুর মাধ্যমে সংশোধন হয় না; বরং তা হলে অনেক সময় নামায বাতিল হয়ে যায়, আর অনেক সময় ছুটে যাওয়া সেই কাজটি পুনরায় করা ব্যতীত নামায শুদ্ধ হয় না। এই সব বড় ভুলের উদাহরণ হচ্ছে, নামাযের রুকন ছুটে যাওয়া। সেই রুকন গুলির মধ্যে যদি কেউ তাকবীরে তাহরীমা ভুলে ছেড়ে দেয়, তাহলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে এবং সাজদায়ে সাহুর মাধ্যমে তা পূরণ হবে না। এ ছাড়া অন্য কোনো রুকন ছুটে গেলে, যেমন রুকু কিংবা সাজদা ছুটে গেলে অতঃপর তার পরের রাকাআতের কিরাআত শুরু করার পূর্বে স্মরণ হলে তৎক্ষণাৎ তা করতে হবে এবং তার পরের বাকি কাজও করতে হবে। আর যদি পরের রাকাআত শুরু করার পর স্মরণ হয়, তাহলে যেই রাকাআতে সেই রুকন ছুটে গেছে তা বাতিল হয়ে যাবে এবং তার পূর্বে সংঘটিত রাকাআতটি সেই স্থানে স্থলাভিষিক্ত হবে। [দেখুন, শারহুল মুমতি, ৩/৩৭১-৩৭২/ আল্ মুলাখ্বাস আল্ ফিকহী, ড. ফাউযান/৭৫]

এতদ্ব্যতীত নামাযের কোনো ওয়াজিব ভুলে ছুটে গেলে, তা সাজদায়ে সাহুর মাধ্যমে পূরণ তথা সংশোধন হয়ে যায়। যেমন প্রথম তাশাহুদ ছুটে যাওয়া, তকবীরে তাহরীমা ব্যতীত বাকি তাকবীর সমূহের কোনো একটি ছুটে যাওয়া, সামিআলগ্‌তাহলিমান হামিদাহ ভুলে না বলা ইত্যাদি। নবী (সাঃ) একদা প্রথম তাশাহুদ ভুলে ছেড়ে দিলে সাহুর দুটি সাজদা করেন। [আহমদ, ৪/২৫৩, তিরমিযী, আবু দাউদ ও বায়হাকী]

নামাযের সুন্নাহ কিছু ছুটে গেলে সাজদায়ে সাহু দেয়া জরুরী নয়; বরং অনেক উলামার নিকট তা না দেয়াই ভাল। কারণ নামাযের সুন্নাহ ছুটে যাওয়ার ফলে নবী (সাঃ) সাজদায়ে সাহু করেছেন মর্মে কোনো দলীল পাওয়া যায় না। তবে একটি আম (ব্যাপক অর্থবোধক) হাদীস তা বৈধতার ইঙ্গিত করে। নবী (সাঃ) বলেনঃ “প্রত্যেক সাহুর বদলে রয়েছে দু’টি সাজদা”। [ইবনু মাজাহ নং ১২১৯, আবু দাউদ নং ১০৩৮, সুত্ৰ হাসান দেখুন ইরওয়াউল গালীল ২/৪৭] উল্লেখ্য যে, নামাযের রুকন ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় ছুটে গেলে নামায হয় না যতক্ষণে তা না করা হয়। ওয়াজিব ইচ্ছাকৃত ছাড়লে নামায বাতিল হয়ে যায় কিন্তু অনিচ্ছায় ছাড়লে সাজদায়ে সাহুর মাধ্যমে তা সংশোধন হয়ে যায়। আর নামাযের সুন্নাহ ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় ছুটে গেলে নামায বাতিল হয় না, তবে পূর্ণ সওয়াব হতে বঞ্চিত হয়। [মুলাখ্বাস আল ফিকহী/৬৩]

২-যে সব কারণে সাজদায়ে সাহু বৈধ হয়ঃ

সাধারণতঃ যে সব কারণে সাজদায়ে সাহু করা বৈধ সেগুলো হল তিনটি। যথা:

ক-নামাযের কিছু বেশী হওয়া।

খ- নামাযের কিছু কম হওয়া।

গ- নামাযে সন্দেহ হওয়া। [শারহুল মুমতি, ৩/৩৩৮]

৩-সাজদায়ে সাহু সালামের পূর্বে না পরে?

অধিকাংশ উলামার মতে সাজদায়ে সাহু সালামের পরে বা পূর্বে দিলে, তা যথেষ্ট হবে এবং নামায শুদ্ধ হবে। কারণ নবী (সাঃ) সাজদায়ে সাহু সালামের পূর্বেও করেছেন এবং পরেও করেছেন। শাওকানী বলেনঃ ‘ক্বাযী ইয়ায এবং শাফেয়ীর অনুসারী এক দল বলেনঃ এই সকল মতভেদকারী উলামা এবং অন্যান্য উলামাদের মধ্যে এতে কোনো মতবিরোধ নেই যে, যদি কেউ নামাযের কম বা বেশীর কারণে সালামের পূর্বে বা পরে সাজদায়ে সাহু দেয়, তাহলে তা যথেষ্ট হবে এবং নামায বিনষ্ট হবে না। মূলতঃ তাদের মতভেদ হচ্ছে, উত্তম কি? [সালামের আগে না পরে?] [নায়লুল আউত্বার, শাওকানী, ৩/১৪২/ আর রাউযাতুননাঈয়াহ, মুহাম্মদ সিদ্দীক হাসান খাঁ, ১/৩২৭/শারহুল মুমতি, ৩/৩৯৪]

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৪৭

অতঃপর আমাদের জানা ভাল যে, সাজদায়ে সাহু সালামের পূর্বে না পরে, কখন হওয়া উত্তম? এ বিষয়ে ইসলামী পন্ডিতদের মধ্যে বড় মতভেদ রয়েছে। কম-বেশী আট টি মত পাওয়া যায়।

ইমাম আবু হানীফা (রহ) এর মতে সর্বাবস্থায় সাজদায়ে সাহু সালামের পরে হবে। কিন্তু এই মত গ্রহণ করলে সেই সব হাদীস প্রত্যাখ্যান করা হয়, যাতে নবী (সাঃ) সালামের পূর্বে সাহুর সাজদা করেছেন বলে প্রমাণিত।

ইমাম শাফেয়ী (রহ) এর মতে সর্বাবস্থায় সাজদায়ে সাহু সালামের পূর্বে হবে। আর এই মত গ্রহণ করলে সেই সব হাদীসের প্রতি আমল হয় না, যেই সব হাদীসে নবী (সাঃ) সালামের পরে সাজদায়ে সাহু করেছেন বলে প্রমাণিত।

তাই এমন একটি সমাধানের পথ হওয়া উচিত, যা গ্রহণ করা হলে উভয় প্রকার হাদীসের প্রতি আমল করা সম্ভব হয়। এমন মতকে সমন্বয়সাধনকারী মত বলে। উলামায়ে কেরাম হতে এই রকম দুটি সুন্দর সমন্বয়কারী মত পাওয়া যায়।

প্রথম মতটি ইমাম শাওকানীর। তিনি বলেনঃ সে সব স্থানে সালামের পূর্বে সাজদায়ে সাহু করা উত্তম যে সব স্থানে নবী (সাঃ) সালামের পূর্বে করেছেন। অনুরূপ এসব স্থানে সালামের পর সাজদায়ে সাহু করা উত্তম যে সব স্থানে নবী (সাঃ) সালামের পর সাজদায়ে সাহু করেছেন। এছাড়া অন্য স্থানে ভুল হলে নামাযী সালামের পূর্বে কিংবা পরে সাজদায়ে সাহু করতে স্বাধীন; কারণ এসব স্থানে কোথায করতে হবে, তা তিনি (সাঃ) থেকে প্রমাণিত নয়।

[নায়লুল আউত্‌দার, ৩/১৪৩]

দ্বিতীয় মতটি ইবনু তায়মিয়াহ এবং ইমাম আহমদের একটি বর্ণনানুযায়ী মত। এই মতানুযায়ী যদি সাজদায়ে সাহু নামাযের কোনো কিছু কমের কারণে হয়, তাহলে সালামের পূর্বে হবে আর যদি কোনো কিছু বেশীর কারণে হয়, তাহলে সালামের পরে হবে। আর সন্দেহের কারণে হলে দুটি অবস্থা হবে। প্রথমতঃ সন্দেহের সময় সঠিক নির্ণয়ে প্রয়াস করতঃ তা নির্ণয় সম্ভব হবে। এমন হলে সালামের পর সাজদায়ে সাহু করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ তিন রাকাআত হল কি চার? এমন হলে তৎক্ষণাৎ সে চেষ্টা চালাবে যে, আসলে কত রাকাআত হল। যদি অনুমানের পালণ্ডা এক দিকে বেশী হয়, তাহলে সেটিই গণনা করবে। তিনের দিকে মনটা বেশী হলে তিন ধরবে আর চারের দিকে বেশী হলে চার ধরবে। এই নিয়মকে ‘তাহারী’ বলে। দ্বিতীয়তঃ সন্দেহের পর কোনো দিকেই অনুমানের পালণ্ডা বেশী হবে না। যেমন তিন হল কি চার? দুই দিকেই বরাবর সন্দেহ। এমন হলে কম সংখ্যা গণনা করবে। অর্থাৎ তিন রাকাআত ধরবে। এটাকে (আল বিনাউ আলাল ইয়াক্বীন) ইয়াক্বীনে প্রতি ভিত্তি করা বলে। এমন হলে সাজদায়ে সাহু সালামের পূর্বে করবে। এই মতানুসারে প্রায় সকল দলীলের প্রতি আমল সম্ভব। এই মতটি আগের মতের তুলনায় বেশী ভাল ও আমলের দিক দিয়ে ব্যাপক কারণ প্রথম মতানুযায়ী যে সব স্থানে সাজদায়ে সাহু প্রমাণিত নেই সেই সব স্থানে ভুল হলে নামাযী আগে বা পরে সাজদায়ে সাহু করতে পারে মর্মে যা বলা হয়েছে তা কোনো দলীলের উপর ভিত্তিশীল নয় কিন্তু দ্বিতীয় মতটি তিন ক্ষেত্রে, কম, বেশী ও সন্দেহের সময় যে সমাধান দেওয়া হয়েছে তাতে যেমন প্রমাণিত স্থানে সাজদায়ে সাহুর প্রতি আমল হয়, তেমন অপ্রমাণিত স্থানে এই সব দলীলের আধারে সমাধান দেওয়া হয়। [আল্লাহই ভাল জানেন]

৪-যে সব কারণে এবং স্থানে নবী (সাঃ) সাজদায়ে সাহু করেছেন, তার বর্ণনাঃ

১-চার রাকাআতের স্থানে পাঁচ রাকাআত পড়া হলে তিনি (সাঃ) সাজদায়ে সাহু সালামের পর করেছেন। আর এটা হচ্ছে নামাযে বেশী হওয়ার উদাহরণ।

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৪৮

صَلَّيْتُ : : الصلاة؟ في أريد : الظهرَ صَلَّى سلم و عليه الله صلى النبي أن :
رواه الجماعة_____ . سَلَّمَ بعدما سجدتين فسجد خمسا،

আব্দুলগাফর বিন মাসউদ হতে বর্ণিত, একদা নবী (সাঃ) যহরের নামায পাঁচ রাকাআত পড়ালেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, নামায কি বেশী করে দেওয়া হয়েছে? তিনি বললেনঃ এ প্রশ্নের কারণ? সাহাবাগণ বললেনঃ আপনি পাঁচ রাকাআত পড়ালেন। তখন তিনি দুটি সাজদা করলেন সালাম ফিরানোর পর”। [বুখারী, স্বালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নং ৩২, হাদীস নং (৪০৪)/ মুসলিম, মাসাজিদ অধ্যায়, নং (১২৮১)]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, এটা শুনার পর তিনি (সাঃ) তাঁর দুই পায়ে বসলেন এবং কিবলামুখী হলেন। অতঃপর দুটি সাজদা করলেন তারপর সালাম ফিলালেন”। [বুখারী, স্বালাত অধ্যায়, নং (৪০১)]

২-চার রাকাআতের স্থানে দুই রাকাআত পড়ে সালাম ফিরালে কিংবা চার রাকাআতের স্থানে তিন রাকাআত পড়ে সালাম ফিরালে, নবী (সাঃ) বাকি রাকাআত সালামের পর পূর্ণ করেন এবং সালাম ফিরান তারপর সাজদায়ে সাহু করেন। বাহ্যত এটা নামাযে কম হওয়ার উদাহরণ মনে হলেও ঐ সকল উলামা এটাকে নামাযে বেশী করার উদাহরণ মনে করেছেন, যারা নামাযের কোনো কিছু বেশী হলে সালাম ফিরানোর পর সাজদায়ে সাহু হবে বলে মত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে বর্তমান অবস্থায় সে নামায পূর্ণ করার পূর্বে সালাম ফিরিয়েছে যা, মূলতঃ নামাযে বেশী করা। [শারহুল মুমতী, ৩/৩৪১]

ক-আবু হুরাইরা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহররাসূল (সাঃ) আমাদের যহর কিংবা আসরের নামায পড়ালেন। তিনি দুই রাকাআত পড়িয়ে সালাম ফিরালেন। [কিছু লোক বলাবলি করতে লাগলো, নামায মনে হয় কম করে দেওয়া হয়েছে!] লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যাকে যুল ইয়াদাঈন বলা হত। সে নবী (সাঃ) কে বললঃ আপনি কি ভুলে গেলেন না নামায কম হয়ে গেছে? তিনি (সাঃ) বললেনঃ না আমি ভুলেছি আর না কম করা হয়েছে। অতঃপর তিনি (সাঃ) বাকি লোকদের বললেনঃ যুল ইয়াদাঈন কি ঠিক বলছে? তারা বললঃ হ্যাঁ। অতঃপর তিনি (সাঃ) বাকি নামায আদায় করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন। তারপর তকবীর দিলেন এবং তাঁর সাজদার মত সাজদা করলেন বা তার চেয়েও একটু দীর্ঘ সাজদা। তারপর তাঁর মাথা উঠালেন এবং তকবীর দিলেন। অতঃপর তকবীর দিয়ে সাজদা করলেন তাঁর সাজদার মত কিংবা তার থেকেও একটু দীর্ঘ সাজদা। তারপর তাঁর মাথা উপরে উঠালেন এবং তকবীর দিলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন”। [বুখারী, সাহু অধ্যায়, নং ১২২৯/মুসলিম, মাসাজিদ অধ্যায়, সাহু অনুচ্ছেদ, নং ১২৮৮]

খ-ইমরান বিন হুসাইন হতে বর্ণিত, একদা নবী (সাঃ) আসরের নামায তিন রাকাআত পড়িয়ে সালাম ফিরান এবং নিজ বাসস্থানে প্রবেশ করেন। অতঃপর খিরবাক নামক ব্যক্তি তাঁকে এটা অবগত করালে তিনি (সাঃ) রাগান্বিত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয়ে লোকদের মাঝে উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেনঃ একি সত্য বলছে? তারা বললঃ হ্যাঁ! অতঃপর তিনি (সাঃ) এক রাকাআত নামায পড়ালেন এবং সালাম ফিরালেন। তারপর দুটি সাজদা করলেন এবং সালাম ফিরালেন”। [মুসলিম, মাসাজিদ অধ্যায়, সাহু অনুচ্ছেদ, নং (১২৯৩)/আবু দাউদ নং (১০১৮) নাসাঈ নং (১২৩৬) ইবনু মাজাহ নং (১২১৫)]

৩-প্ৰথম তাশাহুদ [চার রাকাআত বা তিন রাকাআত বিশিষ্ট নামাযের দুই রাকাআত শেষে তাশাহুদ] ছুটে গেলে, নবী (সাঃ) সালামের পূর্বে সাজদায়ে সাহু করেন অতঃপর সালাম ফিরান। এখানে নামাযের অংশ কম হওয়ায় সাজদায়ে সাহু সালামের পূর্বে হবে।

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৪৯

আব্দুলগাফর বিন বুহাইনা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী (সাঃ) তাদের যহরের নামায পড়ান। প্রথম দুই রাকাআত শেষে না বসেই উঠে যান। লোকেরাও তাঁর সাথে উঠে পড়েন। যখন নামায শেষ হয় এবং লোকেরা তাঁর সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করতে লাগে, তিনি (সাঃ) বসা অবস্থায় তকবীর দেন, সালামের পূর্বে দুটি সাজদা করেন অতঃপর সালাম ফিরান। [বুখারী, সাহ অধ্যায়, নং (১২২৪-১২২৫)/নাসাঈ, নং (১১৭৬)]

উপরোক্ত অবস্থায় ইমাম যদি পুরোপুরি দাঁড়ানোর পূর্বে তাঁর এই ভুল জানতে পারে, তাহলে বসে পড়বে। আর পুরো দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর জানতে পারলে বসবে না। বরং সাজদায়ে সাহ করবে। [আবু দাউদ, স্বালাত অধ্যায়, নং (১০৩৬) ইবনু মাজাহ, নং (১২০৮)]

৪-নামাযের রাকাআত সংখ্যায় সন্দেহ হওয়ার পর কোনো এক দিকে ধারণা প্রবল হলে, নবী (সাঃ) সাজদায়ে সাহ সালামের পর করতে বলেছেন। যেমন কারো সন্দেহ হল, তিন রাকাআত হল কি চার? অতঃপর অনুমান তিনের দিকে বেশী হল, তখন তা তিনই ধরতে হবে এবং এই সন্দেহের কারণে সালামের পর সাজদায়ে সাহ করতে হবে। নবী (সাঃ) বলেনঃ “তোমাদের কেউ নামাযে সন্দেহে পড়লে সে যেন সঠিক নির্ণয়ে চেষ্টা করে এবং তা করে। অতঃপর সে যেন সালাম ফিরায় এবং তার পর দুটি সাজদা করে”। [বুখারী, স্বালাত অধ্যায়, নং (৪০১) মুসলিম, নং (১২৭৪)]

৫- নামাযের রাকাআত সংখ্যায় সন্দেহ হওয়ার পর কোনো এক দিকে ধারণা প্রবল না হলে, কম সংখ্যা ধরতে হবে এবং এই রকম ক্ষেত্রে সাজদায়ে সাহ সালামের পূর্বে হবে। যেমন কারো সন্দেহ হল যে, দুই রাকাআত পড়েছে কি তিন? আর কোনো দিকেই অনুমান বেশী হয় না। এমন ক্ষেত্রে কম সংখ্যা গণনা করতে হবে অর্থাৎ দুই রাকাআত ধরতে হবে এবং সালামের পূর্বে সাজদায়ে সাহ করতে হবে।

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেনঃ “যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নামাযে সন্দেহে পড়বে আর জানতে পারবে না যে, সে তিন রাকাআত পড়লো না চার রাকাআত, তাহলে সে যেন সন্দেহকে প্রত্যাখ্যান করে আর যাতে সন্দেহ নেই তার উপর ভিত্তি করে। অতঃপর সালামের পূর্বে সে যেন দুটি সাজদা দেয়। যদি তার অবস্থা এমন হয় যে, সে পাঁচ রাকাআত পড়েছে, তাহলে (সেই দুটি সাজদা) তার নামাযকে জোড়া করে দিবে। আর যদি সে চার রাকাআত পূরণার্থে পড়েছে, তাহলে সেই দুটি সাজদা শয়তানকে লাঞ্ছিত করা স্বরূপ হবে”। [মুসলিম, মাসাজিদ অধ্যায়, নামাযে সাহ অধ্যায়, নং ১২৭২/মুসনাদ আহমদ, ৩/৭২]

উপরের বর্ণনাসমূহের সারাংশঃ

উপরে বর্ণিত হাদীস সমূহ থেকে নবী (সাঃ) এর যে সব স্থানে সাহ হয়েছে, তার বিবরণ নিম্নরূপঃ

১-চার রাকাআতের স্থানে পাঁচ পড়েছেন এবং এমন সময় তিনি (সাঃ) সাজদায়ে সাহ সালামের পর করেছেন।

২-চার রাকাআতের স্থানে দুই রাকাআত পড়ে সালাম ফিরিয়েছেন অনুরূপ চার রাকাআতের স্থানে তিন রাকাআত পড়িয়ে সালাম ফিরিয়েছেন এবং এই সময়ে তিনি (সাঃ) সালাম ফিরানোর পর সাজদায়ে সাহ করেছেন।

৩-প্রথম তাশাহুদ না পড়েই তৃতীয় রাকাআতের জন্য উঠে পড়েছেন। এমতবস্থায় তিনি (সাঃ) সাজদায়ে সাহ সালামের পূর্বে করেছেন।

৪ এবং ৫-নামাযের রাকাআত সংখ্যায় সন্দেহ হওয়া অতঃপর কোনো এক সংখ্যার দিকে একীকরণ হওয়া কিংবা না হওয়া। এই দুই স্থানে তাঁর সাহ হয়েছে বলে প্রমাণ নেই কিন্তু তাঁর

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৫০

হাদীস রয়েছে। সন্দেহের পর কোনো এক সংখ্যার দিকে অনুমান বেশী হলে তিনি (সাঃ) সাজদায়ে সাহু সালামের পর করতে বলেছেন। আর সন্দেহের পর দুই সংখ্যার কোনো দিকেই একীক না হলে কম সংখ্যা ধরতে বলেছেন এবং এই সময় তিনি (সাঃ) সাজদায়ে সাহু সালামের পূর্বে করতে বলেছেন।

তাই উপরোক্ত স্থানে সাহু হলে বর্ণনানুযায়ী সালামের আগে বা পরে সাজদায়ে সাহু করা উত্তম। আর অন্য স্থানে সাহু হলে দেখতে হবে সেই সাহু উপরোক্ত কোন্ সাহুর সাথে মিল রাখে? অতঃপর সেই অনুযায়ী আগে বা পরে সাজদায়ে সাহু করতে হবে। আর কেউ যদি তা নির্ণয় করতে সক্ষম না হয়, তাহলে আগে বা পরে যে কোনো সময় সাজদায়ে সাহু করা বৈধ হবে ইন্ শাআল্লাহু তাআলা।

৫-সাজদায়ে সাহু করার নিয়মঃ

সাজদায়ে সাহুর পূর্বে তকবীর দিয়ে ঐ ভাবে দুটি সাজদা করতে হবে যেভাবে নামাযে সাজদা করা হয়। এই সময় নামাযের সাজদার যা বিধান, তা এই সাজদায়েও প্রযোজ্য। [উপরোক্ত দলীলগুলির আলোকে]

৬-ইমাম সাজদায়ে সাহু করলে মুক্তাদীদেরও সাজদায়ে সাহু করতে হবে; কারণ মুক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ করতে আদিষ্ট। কিন্তু ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সাহু হলে, মুক্তাদী পৃথক ভাবে সাজদায়ে সাহু করবে না। এ বিষয়ে ইবনুল মুনিযির এক্যমত বর্ণনা করেছেন।

[আল্ ইজমা, ইবনুল মুনিযির, পৃ ৮]

৭-সাজদায়ে সাহুর জন্য ভিন্ন তাশাহুদঃ

সাজদায়ে সাহুর পরে আবার আলাদা কোনো তাশাহুদ নেই। এ বিষয়ে ইমরান বিন হুসাইন থেকে যেই হাদীস আবু দাউদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে যে, “একদা নবী (সাঃ) নামাযে সাহু করেন এবং দুটি সাজদা করেন। অতঃপর তাশাহুদ করেন তারপর সালাম ফিরান”, তা অসংরক্ষিত বর্ণনা; বরং সংরক্ষিত সহীহ বর্ণনায় (অতঃপর তাশাহুদ করেন) শব্দটি নেই। উক্ত শব্দটিকে বায়হাকী, ইবনু আব্দুল বার, ইবনু হাজার এবং আলবানী (রাহেমাহুল্লুগাহ) ‘শায’ বলেছেন। অর্থাৎ সং রাভির এমন বর্ণনা যা, তিনি তার থেকে অধিক সং বর্ণনাকারীর বিপরীত বর্ণনা করেছেন [ইরওয়াউল গালীল, ২/১২৮]

প্রকাশ থাকে যে, তাহিয়া পড়ার পর এক দিকে এক সালাম ফিরানোর পর সাজদায়ে সাহু করার কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না।

৮-একই নামাযে একাধিক সাহু হলে, একাধিক সাজদায়ে সাহু নয়; বরং এক বার সাজদায়ে সাহু যথেষ্ট হবে। নবী (সাঃ) এর সাহুতে একাধিক সাহু ঘটেছিল, যেমন রাকাআত কম হওয়া, নামাযের পূর্বে সালাম ফিরিয়ে দেওয়া অতঃপর অন্যের সাথে বাক্যালাপ করা, তার পরেও তিনি এক বারই সাজদায়ে সাহু দেন [বুখারী, সাহু অধ্যায়, নং ১২২৯/মুসলিম, মাসাজিদ অধ্যায়, সাহু অনুচ্ছেদ, নং ১২৮৮]

আমরা এ পূর্বে ইমাম ও মুক্তাদীর কিছু ভুল-ত্রুটি সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করবো ইন্ শাআল্লাহু তাআলা। এসব ভুলের মধ্যে অনেক ভুল এমন রয়েছে যা ছোট প্রকারের কিন্তু তা থেকেও আমাদের সতর্ক থাকা উচিত যেন আমরা পূর্ণ সওয়াবের অধিকারী হতে পারি এবং এ সব ভুল যেন একটি স্বভাবে পরিণত না হয়।

১-ইমামের সূতরা ব্যবহার না করা [বিস্তারিত সূতরা পর্ব দ্রষ্টব্য] ইমাম মসজিদে ইমামতি করুক বা মসজিদের বাইরে, যদি তার সামনে দেয়াল, পিলার, লাঠি বা এই জাতীয় কোনো

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৫১

আড়া না থাকে তাহলে তাকে সুতরা করা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ ব্যাপক অর্থবোধক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ “যখন তোমাদের কেউ নামায আদায় করবে, তখন সে যেন সুতরা সামনে করে নামায আদায় করে এবং সুতারার নিকটবর্তী হয়, তার ও সুতারার মাঝে কাউকে অতিক্রম করতে না দেয়।” [আবু দাউদ, ইবনু খুযায়মাহ (৮১৮) বায়হাক্বী ২/২৬৭]

২-চাঁদ-তারার নকশা আছে এমন জায়নামাযে নামায অবৈধ মনে করাঃ

কিছু লোক এই কারণে সেই সব জায়নামাযে নামায আদায় অবৈধ মনে করে যে, মহানআল্লাহচন্দ্র-সূর্যকে সাজদা করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু এটা তাদের বুঝার ভুল। কারণ এসব জায়নামাযে নামাযী চন্দ্র-সূর্যকে সাজদা করে না বরং আলংগাহকে সাজদা করে। চন্দ্র-সূর্যকে সাজদা করা আলাদা বিষয় আর চাঁদ-তারার উপর সাজদা করা আলাদা বিষয়। যেমন মাটিকে সাজদা করা ভিন্ন বিষয় আর মাটির উপর সাজদা করা ভিন্ন বিষয়। আমাদের ভাল করে জানা দরকার যে, মহানআল্লাহশুধু চাঁদ ও সূর্যকে সাজদা করতে নিষেধ করেন নি বরং সকল সৃষ্টিকে সাজদা করতে নিষেধ করেছেন এবং কেবল তাঁকে সাজদা করতে বলেছেন যিনি এসবের সৃষ্টিকর্তা। হ্যাঁ, তবে এমন জায়নামাযে বা বিছানায় নামায না পড়াই ভাল, যাতে নকশা ও কারুকার্য থাকে, যার ফলে নামাযীর মনযোগে ব্যাঘাত ঘটে।

৩-কিবলামুখী হওয়ার গুরুত্ব না দিয়ে মাইক্রোফোনমুখী হওয়ার গুরুত্ব বেশী দেওয়া। লাউড স্পীকারে নামায পড়ান এমন অনেক ইমামকে দেখা যায়, তারা ইমামতির সময় লাউড স্পীকার ও স্ট্যান্ডকে সম্মুখে ও নিকটে রাখার চেষ্টা করেন। আর এমন করতে গিয়ে অনেক সময় তারা কিবলা থেকে বেকে যান, যা ভুল। কারণ আমরা কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতে আদিষ্ট। স্বেচ্ছায় জেনে-বুঝে কিবলা থেকে বেকে দাঁড়ানো অবশ্যই আদেশ উলংঘন। আমাদের সোজা কিবলার দিকে দাঁড়ানো প্রয়োজন তাতে মাইক্রোফোন সম্মুখে আসুক বা দূরে থাক। এ ক্ষেত্রে ওয়্যারলেস বিশিষ্ট পকেট মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হলে সমস্যার সমাধান হতে পারে।

৪-ইমাম ও মুক্তাদীর লাইন সোজা ও বরাবর না করা: অনেক ইমামকে দেখা

যায়, মুয়াজ্জিনের ইক্বামত শেষ হওয়া মাত্রই তকবীরে তাহরীমা দিয়ে নামায শুরু করে দেন। আর অনেকে সেই সময় লাইন সোজা করার কথা বললেও সোজা হল কি না, তা ভ্রূক্ষেপ না করেই নামায আরম্ভ করে দেন। অন্যদিকে অনেক মুক্তাদী এমনও আছে যারা এটাকে ইমামের ক্রটিন মনে করে তাঁর কথার তোয়াক্কাই করে না; বরং অনেককে দেখা যায়, তার সামনের লাইনে স্থান খালি আছে তা সত্ত্বেও সেই স্থান পূরণ করে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন লাইন বরাবর করা, পূর্ণ করা, মাঝে ফাঁক না রাখা এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোর আদেশ করতেন, তেমন তিনি ইক্বামতের পর স্বয়ং লাইনের দিকে মুখ করে বরাবর হওয়ার আদেশ করতেন, অনেক সময় লাইনের শেষে গিয়ে তাদের বরাবর করতেন। [বুখারী, আযান অধ্যায়, নং ৭১৯, সহীহ ইবনু খুযায়মা নং ১৫৫১-১৫৫২]

৫-বিশেষ শব্দের মাধ্যমে বিভিন্ন নামাযের নিয়ত পড়াঃ আরবী নিয়ত শব্দটির

অর্থ, ইচ্ছা করা, মনস্থ করা। নিয়তের স্থান অশুভ। মনে মনে মানুষ যা ইচ্ছা করে তাই তার নিয়ত। তা সশব্দে নামায শুরু করার পূর্বে পড়া বা নিরবে বলা উভয়ই একটি ভুল এবং তা দ্বীনের বিধান মনে করে করা বিদআত। এমন নিয়ত করতে গিয়ে অনেকে ইমামের পরে পরে তাকবীরে তাহরীমা না দিয়ে অনেকটা দেরীতে দেয়, যা সুন্নার পরিপন্থী। আর অনেকে

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৫২

বিড় বিড় করে পড়ার কারণে তার পাশের নামাযীকে কষ্ট দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে নামায শুরু করতেন এবং অন্যকে তা দ্বারা শুরু করার আদেশ করতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে ভুলকারীকে শিক্ষা দেনঃ “যখন নামাযে দাঁড়াবে, পূর্ণরূপে অযু করে নিবে, অতঃপর কিবলামুখী হবে, তারপর তাকবীর দিবে, অতঃপর কুরআনের সহজতর যা তোমার মুখশুঁ আছে তা পড়বে” [বুখারী, নং ৭৯৩]

৬-তাকবীর বলার সময় আল্লাহ্ আকবার এর (বা) টেনে পড়াঃ আযান হোক বা নামায, এই সময় আলশাখ্ আক্ বার বলার সময় (বা) টান দিয়ে বলা নিষেধ। কারণ (বা) এ মাদ্দ দিলে অর্থ পাল্টে যায়। বিনা মাদ্দের (আকবার) অর্থ সবচেয়ে বড় আর মাদ্দ সহকারে আকবার অর্থ, তবলা। ইমাম আল্লাহ্ আক্ বার দীর্ঘ করে বললে আরো একটি সমস্যা হয়ে থাকে, তা হলঃ ইমামের তাকবীর শেষ হওয়ার পূর্বে অনেক মুক্তাদীর তাকবীর শেষ হয়ে যাওয়া; কারণ মুক্তাদী তত দীর্ঘ করে বলে না। আর ইমামের পূর্বে তাকবীর দেওয়া নিষেধ। বিষয়টি যদি তাকবীরে তাহরীমার ক্ষেত্রে হয়, তাহলে নামায বাতিল হওয়ারও আশংকা থাকে। [ইরশাদাত আন বা'যিল মুখালাফাত, সাদহান, পৃঃ ৯৬] আবার কিছু ইমামকে দেখা যায় তারা বিশেষ বিশেষ স্থানের তাকবীর টেনে বলেন আর বাকিগুলো সাধারণ ভাবে। যেমন তাশাহুদে বসার সময় কিংবা রুকু থেকে উঠার সময় কিংবা রুকুতে যাওয়ার সময়ের তাকবীর দীর্ঘ করেন আর বাকিগুলো স্বাভাবিক; অথচ এমন পার্থক্য করার কোনো দলীল নেই। তাই সব তাকবীর সাধারণতঃ বরাবর হবে এটাই সঠিক নিয়ম।

৭-তাকবীরে তাহরীমার সময় কান স্পর্শ করা এবং হাতের তালু চিপের দিকে রাখাঃ অনেক মুসালাফীকে দেখা যায়, তারা নামায শুরু করার সময় কানের লতি স্পর্শ করে; অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কান স্পর্শ করতেন না বরং তাঁর হাতের আঙুল অনেক সময় বাহ্ বরার উঠাতেন আর অনেক সময় কান বরাবর। যারা কানের লতি স্পর্শ করে, তারা আরো একটি ভুল করে তা হল, কানের লতি ছোঁয়ার কারণে তাদের হাতের তালু কানের দিকে থাকে; অথচ এই সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতের তালু কিবলামুখী থাকতো। [আবু দাউদ (৭৭৫) তিরমিযী (২৪২) মুসলিম (৩৯৮)]

৮-এমন বিশ্বাস রাখা যে, মুয়াজ্জিন ব্যতীত অন্য কেউ ইকামত দিতে পারে নাঃ এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস “যে আযান দিবে সেই ইকামত দিবে” খুবই যয়ীফ। [সিলসিলা যয়ীফা নং (৩৫)] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মুয়াজ্জিনকে ইকামত দেয়ার আদেশ করলে সে ইকামত দিত। তাই ইমাম মুয়াজ্জিনকে যখন ইকামত দেওয়ার আদেশ করবেন, তখন সে ইকামত দিবে। আর মুয়াজ্জিনের অনুপস্থিতিতে ইমাম যাকে ইকামত দিতে বলবেন, সেই ইকামত দিতে পারে।

৯-নামাযে কিরাআত, দুআ ও যিকর পড়ার সময় জিহ্বা না নাড়িয়ে মনে মনে পড়াঃ অনেকে একাকি কিংবা ইমামের পিছনে নামায পড়ার সময়, কিরাআত, তাকবীর, রুকু-সাজদা সহ অন্যান্য স্থানের দুআ সমূহ মনে মনে পড়ে, যেন নামায কিছু কাজের নাম মুখে কিছু পড়ার নয়। জিহ্বা ও ঠোঁট না নাড়িয়ে মনে মনে কিছু বলা বা করার ইচ্ছা করা, সেটা অবৈধ কিছু হলেও আল্লাহ তাআলা তা পাকড়াও করবেন না। নবী (সাঃ) বলেনঃ “আলশাখ্ তাআলা আমার উম্মতকে ক্ষমা করেছেন, যা তাদের অশুড় বলে”। [হাদীস সহীহ, দেখুন ইরওয়াউল

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৫৩

গালীল নং ২০৬২। তাই মনের কথা শরীয়ার দৃষ্টিতে অবিবেচ্য। আর এমন হলে নামাযে মনে মনে সূরা, দুআ ও যিকর পাঠকারীর আমলও অধর্তব্য।

১০-ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের তাকবীর, রাব্বানাওয়ালাকাল্ হাম্দ সহ ইত্যাদি দুআ-যিকর সশব্দে পড়াঃ

ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের অবস্থা হচ্ছে সিররী অবস্থা। অর্থাৎ সূরা ফাতিহা সহ ইত্যাদি দুআ-যিকর নিরবে পাঠ করা। এসব সশব্দে পাঠ করা যেমন ভুল তেমন এমন করলে ইমাম সহ অন্যান্য মুক্তাদীদের খুশু-খুযুতে ব্যাঘাত ঘটে ও জটিলতা সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে কোনো সাহাবীর নির্দিষ্ট স্থানে সরবে কিছু পড়া একটি খাস বা নির্দিষ্ট ঘটনা, তা সাধারণ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

১১-নামাযে চোখ বন্ধ রাখা কিংবা আকাশের দিকে দেখাঃ নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের সময় তাঁর চক্ষু বন্ধ রাখতেন না; বরং তাশাহুদদের সময় তাঁর দৃষ্টি শাহাদাত (তর্জনী) অঙগুলির দিকে থাকতো এবং দশায়মান অবস্থায় সাজদার স্থানে থাকতো। অনুরূপ তিনি নামাযের সময় আকাশের দিকে তাকাতে কঠোর ভাবে নিষেধ করতেন। অনেকে নামাযে একগ্রতা সৃষ্টির জন্য এমন করে থাকে, যা সুল্লাত বিরোধী। [আল্ কাউলুল মুবীন ফী আখতাইল মুসাল্লীন, পৃঃ ১১০-১১২]

১২-বাটকা দিয়ে রুকুতে যাওয়া এবং বাটকা দিয়ে রুকু থেকে উঠাঃ অনেকে রুকু করার সময় শরীরে একটা বাটকা দিয়ে দ্রুত গতিতে রুকুতে যায় এবং এই সময় রুকু অবস্থায় তার শরীরে কম্পন থাকে। দুই তিনবার কম্পনের পর তার শরীর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। অনুরূপ সাজদা ও সাজদা থেকে উঠার সময় এবং সালাম ফিরানোর সময় অনেককে এমন করতে দেখা যায়, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামাযের পদ্ধতির বিপরীত। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকু সাজদায় যাওয়ার সময় স্বাভাবিক ভাবে যেতেন, না দ্রুত যেতেন আর না অতি ধীর গতিতে।

১৩-সূরা ফাতিহা কিংবা সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পাঠ শেষ করার পূর্বেই হাত ছেড়ে দেওয়া। এসময় সূরা-কিরাআত শেষ হওয়ার পর হাত ছাড়া উচিত।

১৪-ইমাম যখন ‘সামিআলগাছলিমান হামিদাহ’ বলেন, তখন মুক্তাদীদের অনেকে শুধু ‘রব্বানা ওয়ালাকাল্ হাম্দ’ বলে থাকে; অথচ ইমাম ও মুক্তাদী উভয়কে সামিআলগাছল্ এবং রাব্বানা ওয়ালাকাল্ দরকার। [তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ১৯০-১৯১]

১৫-রুকু-সাজদায় স্থির না হওয়া অনুরূপ রুকু-সাজদা থেকে উঠে বরাবর হয়ে স্থিরতা অবলম্বন না করা: মনে রাখা দরকার এদুটি নামাযের রুকুন তা না করলে নামায বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায ভুলকারীকে রুকু-সাজদায় স্থির হতে বলেন এবং উভয় স্থান থেকে উঠেও স্থির হতে বলেন এবং তার পরে নামাযের পরের কাজটি করতে আদেশ করেন। [বুখারী, নং ৭৫৭ মুসলিম নং ৩৯৭]

১৬-সাজদার সময় সাতটি অঙ্গ মাটিতে না রাখাঃ সাজদার সাতটি অঙ্গ হচ্ছে যথাক্রমে কপাল সহ নাক, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পার সামনের পাতা। অনেকে কপাল মাটিতে রাখে কিন্তু নাক রাখে না। আর অনেকে সাজদার সময় দুই পা মাটি থেকে উপরে রাখে কিংবা এক পা আর এক পার উপর রাখে, যা বড় ভুল। এই সময় উপরোক্ত সাতটি অঙ্গের মাধ্যমে সাজদা হবে। নবী (সাঃ) বলেনঃ “আমাকে আদেশ করা হয়েছে, যেন আমি সাতটি অঙ্গের উপর সাজদা করি”। [মুসলিম নং ৪৯১, তিরমিযী নং ২৭২] অন্য বর্ণনায় সাতটি হাড়ের কথা এসেছে।

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৫৪

১৭-সাজদার পদ্ধতিতে ভুল করাঃ সাজদা যেমন সাতটি অঙ্গের উপর হবে, তেমন সাজদার সময় দুই উরু থেকে পেট পৃথক থাকবে, দুই বাহু পার্শ্বদেশ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকবে, হাতের জঙ্ঘা (হাতের কুনুই থেকে কজি পর্যন্ত অংশ) মাটি থেকে উপরে থাকবে মাটিতে বিছানো থাকবে না এবং দুই হাতের তালু দুই কাঁধ বা দুই কান বরাবর থাকবে। দুই পায়ের পাতার সামনের ভিতরের অংশ মাটিতে ঠেকে থাকবে, গোড়ালি সম্মিলিত ভাবে উপরে থাকবে এবং আঙুলসমূহ কিবলামুখী থাকবে। [বিস্তারিত দেখুন, আল্ কাউলুল মুবীন, ফী আখত্বাইল মুখালগীন, মাহসূর হাসান, নং ১৩৭-১৩৮]

১৮-অসুস্থতা কিংবা অন্য কারণে নামাযী মাটিতে সাজদা করতে অক্ষম হলে, বালিশ, টেবিল বা উঁচু কিছুতে সাজদাকরাঃ

নামাযী কোনো কারণে যদি সরাসরি মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে সাজদা করতে না পারে, তাহলে সে কোনো উঁচু যিনিস যেমন বালিশ, কাঠ, টেবিল কিংবা অন্য কিছুতে সাজদা করবে না; বরং যতটা পারবে সাজদার জন্য ঝুকবে এবং ইশারায় সাজদা করবে। আর রুকু অপেক্ষা সাজদায় বেশী ঝুকবে। [ত্বাবারানী, সূত্র সহীহ, দেখুন সিলসিলা সহীহা নং (৩২৩)]

১৯-তাওয়াররুক ও ইফতিরাশে ভুল করাঃ ইফতিরাশ হল, দুই রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে তাশাহুদে বসার সময় ডান পা খাড়া রাখা এবং বাম পায়ের উপর বসা। আর তাওয়াররুক হচ্ছে তিন বা চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযের শেষ বৈঠকে ডান পা খাড়া রেখে বাম পা ডান পায়ের জঙ্ঘার মাঝ দিয়ে বের করে দিয়ে নিতম্বের ভরে বসা। এই আমল অনেকে করেই না। আর অনেকে প্রথম তাশাহুদে কিংবা দুই রাকাআত বিশিষ্ট নামাযের শেষ তাশাহুদে তাওয়াররুক করে; অথচ এটা তিন বা চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযের শেষ বৈঠকে হবে। [হাদীস আবু হুমাইদ, বুখারী, নং (৮২৮)]

২০-লম্বা স্বরে সালাম ফিরানোঃ সালাম ফিরানোর সময় স্বাভাবিক নিয়মে সালাম ফিরানো সুন্নাত। এই সময় অনেকে সালামের কোনো শব্দ যেমন (আস্ সালামু) বা (বারাকাতুহু) দীর্ঘ স্বরে টেনে পড়ে। এই রকম টেনে বলার কারণে অনেক সময় মুক্তাদী ইমামের পূর্বে সালাম ফিরিয়ে দেয় নচেৎ ইমামের পূর্বে তার সালাম উচ্চারণ সমাপ্ত হয়ে যায়, যা অবশ্যই সুন্নাহ বিরোধী কাজ, যেটা ইমামের দীর্ঘ স্বরে সালাম ফিরানোর কারণে হয়ে থাকে।

২১-সালামের পর মুসাফাহা করাঃ অনেকে ফরয নামাযের সালামের পর তার ডান-বাম পাশের মুসলন্টার সাথে মুসাফাহা করে, যা একটি নতুন আমল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাগণ থেকে নামাযের সালাম শেষে মুসাফাহা করা প্রমাণিত নয়। অনেকে আবার বিশেষ করে ফজর ও আসর নামাযায়ে এমন করে থাকে। উল্লেখ্য যে, দূর থেকে আগত ব্যক্তির জন্য এটা সুন্নাহ যে, সে মুসলিম ভাইর সাথে সালামের পর মুসাফাহা করবে। তাই এমন ব্যক্তি হলে সে পাশের নামাযীর সাথে মুসাফাহা করতে পারে; নচেৎ না [আল্ ইরশাদাত আন্ বা'যিল মুখালাফাত/১২০] এই মুসাফাহা করতে গিয়ে অনেকে নামাযীর যিকর ও তাসবীহ কাজে ব্যাঘাত ঘটায়।

২২-আঙুলের গিরা ছেড়ে তসবীহ দানায় তাসবীহ পাঠঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান হাতে তাসবীহ পাঠ করতেন। [আবু দাউদ নং (১৫০২) তিরমিযী নং (৩৪৮৪)] এবং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঙুলের গিরায় তাসবীহ পাঠ করার আদেশ দেন এবং বলেনঃ সেগুলোকে কথা বলানো হবে।” [আবু দাউদ নং (১৫০১) হাদীসটিকে

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৫৫

হাকেম ও যাহাবী সহীহ বলেছেন, নভবী ও আসক্বালানী হাসান বলেছেন এবং আলবানী যয়ীফ বলেছেন। শাইখ আলবানী (রহ) বলেনঃ “তসবীহ দানায় তাসবীহ পড়ার মন্দসমূহের মধ্যে একটিই যথেষ্ট যে, এই নিয়ম আঙুলে গুণে গুণে তাসবীহ পড়ার সুন্নতকে শেষ করে দিয়েছে কিংবা প্রায় শেষ করে দিয়েছে”। [সিলসিলা যয়ীফা, ১/১১৭]

২৩-ইমামের সাথে একজন মুক্তাদী থাকলে ইমামের একটু আগে অবস্থান করাঃ এ সম্পর্কে সহীহ নিয়ম হচ্ছে, ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে এক অপরের বরাবর দাঁড়াবে। ইমাম একটু আগে অবস্থান করবে না আর না মুক্তাদী ইমামের একটু পিছনে দাঁড়াবে। ইমাম বুখারী এ সম্পর্কে এক অনুচ্ছেদ রচনা করেনঃ (অনুচ্ছেদ, দুই জন হলে মুক্তাদী ইমামের ডান পাশে তার বরাবর দাঁড়াবে) [বুখারী, আযান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নং ৫৭, হাদীস নং ৬৯৭] অতঃপর ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এর ঐ ঘটনা উল্লেখ করেন, যাতে তিনি তার খালা উম্মুল মুমেনীন মায়মূনা (রাযিঃ) এর নিকট রাত অতিবাহিত করেন এবং রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কিয়মুল লাইল আদায় করেন। মুসনাদ আহমদে বিষয়টি আরোও স্পষ্ট এসেছে। [দেখুন, সিলসিলা সহীহা, নং (৬০৬)]

২৪-নফল স্বালাত আদায়কারীর সাথে কেউ ফরয আদায় করার ইচ্ছায় তার সাথে শরীক হলে, নফল আদায়কারীর তাকে হাত দ্বারা বা ইশারা-ইঙ্গিতে সরিয়ে দেওয়া। এটি ভুল। [চতুর্থ পর্ব দৃষ্টব্য]

২৫-নামায অবস্থায় হাই আসলে তা অপসারণের চেষ্টা না করাঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

“যদি তোমাদের কেউ নামাযে হাই তোলে, তাহলে সে যেন যথা সম্ভব তা চেপে রাখে; কারণ শয়তান প্রবেশ করে”। [আহমদ, মুসলিম নং ২৯৯৫]

চেপে রাখার নিয়ম হবে, সে যেন তার হাত মুখে রাখে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ “যদি তোমাদের কেউ হাই তোলে, তাহলে সে যেন তার হাত মুখে দেয়”। [মুসলিম, নং ২৯৯৫]

২৬-ফরয নামাযান্বেই ইমাম ও মুক্তাদীদের সম্মিলিতভাবে দুআ করা। এছাড়াও ইমাম ও মুক্তাদীদের অনেক ভুল-ত্রুটি নামাযে ঘটে থাকে। কিন্তু এ স্থানে সব ভুলের আলোচনা সম্ভব নয়। তাই এই বিষয়ের এখানেই সমাপ্তি ঘটানো হল। তাছাড়া আমাদের ধারাবাহিক পর্বে বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরো অনেক ভুল-ত্রুটির আলোচনা হয়েছে। আল্লাহর কাছে দুআ করি তিনি যেন আমাদের সঠিক সুন্নাহ অনুযায়ী নামায আদায় করার তাওফীক দেন এবং তা কবুল করেন। আমীন।

ফরয নামাযান্বেই ইমাম ও মুক্তাদীদের হাত তুলে সম্মিলিতভাবে দুয়া করাঃ

আল্ হামদু লিল্লাহি রাব্বিল্ আলামীন, ওয়াস্ব স্বালাতু ওয়াস্ব সালামু আলা রাসূলিলহি কারীম। আম্মা বাদঃ বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিষয়টি বহু প্রাচীন এবং এ সম্পর্কে বিগত উলামাগণ যথেষ্ট লেখা-লেখি ও করেছেন। কিন্তু যেহেতু বিষয়টির সম্পর্ক আমাদের আলোচ্য বিষয় ইমাম ও ইমামতির সাথে রয়েছে তাই কিছু আলোচনা করা সঙ্গত মনে করছি। ওয়া মা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

১ সমাজের সাধারণ লোকদের এই দুয়া সম্পর্কে ধারণাঃ

যেই সমাজে এই দুয়ার প্রথা রয়েছে সেখানকার লোকেরা এই দুয়া সম্পর্কে যে ধারণা ও বিশ্বাস রাখে তার সামান্য বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরলাম। যেখানে এই দুয়ার প্রথা চালু আসে সেখানে কোনো কারণে কাউকে যদি ইমামতি করতে হয় এবং ইমাম সালাম শেষে দুয়া না শুরু করে, তাহলে পিছনের মুসলণ্টারা দুয়ার অপেক্ষায় থাকে। অনেক সময় মুক্তাদীদের

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৫৬

কেউ আদেশ কিংবা আবেদনের সুরে বলেই দেয়, দুয়া করে দিন। ভাবটা এমন যে, এই দুয়া তারা নিজে করতে পারে না ইমামের নেতৃত্বেই করতে হবে এবং এই কাজ ব্যতীত যেন তাদের নামায শেষ হয় নি, তাই তারা সমাগু করার উদ্দেশ্যে অপেক্ষায় রয়েছে।

অনেক স্থানে কোনো ইমাম নিয়মিত দুয়া না করার কারণে ইমামতি হারায়। অর্থাৎ আপনি এই সম্মিলিত দুয়াকারী হলেই তাদের ইমাম হতে পারেন; নচেৎ নয়। তাদের এই আচরণে এটাই প্রকাশ পায় যে, তারা এই কাজকে খুবই গুরুত্ব দেয় এবং তা না করলে তার পিছনে নামায আদায় করে না।

অতঃপর দুয়া না করে কোনো ইমাম যদি সুন্নত নামায শুরু করে দেয় কিংবা মসজিদ থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে শুরু হয় মশ্‌ড়ব্বের পর মশ্‌ড়ব্ব। এটা কেমন ইমাম নামাযের পর মুনাযাতই করলো না! একে কে ইমাম বানালা? দুয়া করা কি অপরাধ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি দুয়া করতেন না? আল্লাহ তাআলা কি কুরআনে দুয়া করতে বলেন নি? দুয়া করলে ক্ষতিটা কি? কেউ আবার উপমা পেশ করে বলেঃ এই ইমাম ভাত খাওয়ালো কিন্তু পানি খাওয়ালো না। ইত্যাদি মশ্‌ড়ব্ব যার অনেকেটা অবাস্‌ড়র ও বিরক্তকরও বটে।

কোথাও আবার বাহ্যত সম্মিলিত দুয়ার প্রথা নেই কিন্তু কৌশলে সেই প্রথা জিইয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। তাই কেউ ফরমাইশ করে বলেঃ অমুক সমস্যা রয়েছে, তমুক অসুস্থ, কিছু না পেলে সবসময়ের সমস্যা উল্লেখকরে বলেঃ বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের অবস্থা শোচনীয় তাই দুয়া করে দিন। কেউ যেন তাদের শিক্ষা দিয়েছে যে এমনি এমনি এই রকম দুয়া ঠিক নয় কিন্তু ফরমাইশী দুয়া (আবেদনের দুয়া) ঠিক আছে।

যাই হোক উপরোক্ত সকলের কথা ও ভাবে এটা স্পষ্ট হয় যে, তারা এই দুয়ার একটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অনেকে এটাকে নামাযের একটি অংশও মনে করে থাকে, তা না করলে নামাযের ঘাটতি মনে করে। কম পক্ষে বলতে পারেন, তারা এমন করাকে ভাল মনে করে।

এখন প্রশ্ন হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি এমন করতেন; অথচ তিনি নামায ফরয হওয়ার পর সারা জীবন ইমামতি করেছেন? এমন করার প্রথা কোনো সাহাবী কি বর্ণনা করেছেন; অথচ তারা বহু সংখ্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুকরণে তাঁর পিছনে নামায আদায় করেছেন? এমন একটি ইবাদত যা দিন-রাতে পাঁচবার আদায় করা হয়, তাতে এমন দুয়ার নিয়ম থাকলে তাঁরা কি বর্ণনা করতেন না? আর যদি এই নিয়মেই না থাকে, তাহলে আমাদের এমন করা দ্বীনে নতুল আমল সৃষ্টি করা নয় কি?

২সালাম শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করতেনঃ

মহান আল্লাহ বলেনঃ (যখন তোমরা নামায আদায় করে নিবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আল্লাহর যিকর করবে) [সূরা নিসা/১০৩] অনুরূপ মহান আল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত শেষে তাঁর যিকর করার আদেশ করেন। যেমন রামাযানের সিয়াম শেষে [সূরা বাকারাহ/১৮৫] এবং হজ্জ সম্পাদন শেষে। [বাকারাহ/২০০]

তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শেষে বেশী বেশী যিকর-আযকার করতেন, যার বিস্তারিত বর্ণনা হাদীসের গ্রন্থসমূহে এবং সীরাতে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বীনের সুস্বাস্ত সুস্বাদ বিষয়ের বিশিষ্ট গবেষক বাকর আবু যাইদ (রাহেঃ) বলেনঃ ‘ফরয নামাযের সালামের পর সুন্নত হচ্ছে, কতিপয় যিকর সামান্য সশব্দে করা সমূহ যিকর সশব্দে নয়, দুয়া করা, কুরআনুল কারীম থেকে যা বর্ণিত তা পাঠ করা এবং সুন্নত হচ্ছে প্রত্যেক মুসল্লীর নিজে নিজে এসব করা’। [তাহযাহীহুদুআ/৪৩৮] অতঃপর তিনি সহীহ বর্ণনার আলোকে সেগুলি তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য যে, যিকর এমন শব্দ ও বাক্যকে বলে যা দ্বারা আল্লাহর মহত্ত্ব, বড়ত্ব এবং তাঁর গুণগান করা হয়। আর দুয়া এমন শব্দ বা বাক্যকে বলা হয়, যার মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকা

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৫৭

হয়, তাঁর নিকট প্রার্থনা করা হয়, তাঁর কাছে আবেদন করা হয়। কোনো কোনো সময় দুটি এক অপরের অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

ক. নামায শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত যিকরের বর্ণনাঃ (সংক্ষিপ্তাকারে)

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম ফিরানোর পর তিন বার ‘আস্‌তগ্‌ফিরুল্লাহ’ বলতেন। অতঃপর বলতেনঃ “আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালাম ওয়া মিনকাস্ সালাম, তাবারাকতা ইয়া যাল্ জালালি ওয়ায়্ ইকরাম”। [সহীহ মুসলিম, মাসাজিদ অধ্যায় নং ৫৯১] তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সময় কিবলামুখী হয়ে প্রায় ততক্ষণ থাকতেন যতক্ষণ উপরোক্ত যিকর বলতে সময় লাগে। তার পর মুসাল্লীদের দিকে মুখ করে ফিরে বসতেন। [যাদুল মাআদ, ১/২৯৫]

সহীহাইনের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শেষ করার পর বলতেনঃ “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্ দাহ্ লা শারীকা লাহ্, লাহ্‌ল্‌ মুলকু ওয়ালাহ্‌ল্‌ হামদু ওহুআ আলা কুল্লি শায়ইন্‌ ক্বাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানিআ লিমা আত্বায়তা ওয়া লা-মুত্তিয়া লিমা মানাতা, ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল্‌ জাদি মিনকাল্‌ জাদু”। [বুখারী, নামাযের নিয়ম অধ্যায়, নং ৮৪৪/মুসলিম, নং ৫৯৩]

আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিঃ) বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নামাযের শেষে যখন সালাম ফিরাতেন, তখন এই বাক্যগুলি বলতেনঃ “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহ্‌ লা শারীকা লাহ্, লাহ্‌ল্‌ মুলকু, ওয়া লাহ্‌ল্‌ হামদু ওয়া হুআ আলা কুল্লি শায়ইন্‌ ক্বাদীর। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া লাও কারিহাল্‌ কাফিরান” পর্যন্ত। [সহী মুসলিম, মাসাজিদ অধ্যায়, নং ৫৯৪]

অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল্‌ হামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার এবং ১০০ পূরণে বলতেনঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহ্‌, লা শারীকা লাহ্, লাহ্‌ল্‌ মুলকু, ওয়ালাহ্‌ল্‌ হামদু, ওয়া হুআ আলা কুল্লি শায়ইন্‌ ক্বাদীর। [মুসলিম, মাসাজিদ অধ্যায়, নং ৫৯৭] এই তাসবীহ পাঠের আরো ৫টি পদ্ধতি প্রমাণিত। [দেখুন, তাস্বহীহুদ দুয়া পৃঃ ৪৩২ এবং যাদুল মাআদ, ১/২৯৮-২৯৯]

খনামায শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক কুরআনের কিছু অংশ ও সূরা পড়ার বর্ণনাঃ

আয়াতুল্‌ কুরসী পাঠ করাঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ “যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পশ্চাদে আয়াতুল্‌ কুরসী পাঠ করবে, তার জন্মাতে প্রবেশ করা থেকে মৃত্যু ব্যতীত কোনো কিছু বাধা হবে না” [নাসাজি, নং ৯৯২৮, তারগীব ও তারহীব, ২/২৬১, ইবনু হিব্বান]

সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্‌ এবং সূরা নাস পাঠ করাঃ উক্বা বিন আমের থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেছেন যেন আমি প্রত্যেক নামাযের পশ্চাদে মুআক্কিয়াত (আশ্রয় চাওয়ার সূরাসমূহ যথাক্রমে ইখলাস, ফালাক্‌ ও নাস) পাঠ করি। [মুসনাদ আহমদ ৪/২১১, আবু দাউদ নং (১৫২৩), ইবনু হিব্বান (২৩৪৭), তিরমিযী (২৯০৫) তবে তাতে কেবল সূরা নাস ও ফালাক্‌ উল্লেখ হয়েছে]

গুনামাযান্‌দে সালামের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে দুয়ার প্রমাণঃ

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৫৮

আবু উমামাহ থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হয়ঃ কোন দুয়া বেশী কবুল হয়? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ “রাতের শেষাংশে এবং ফরয নামাযের পশ্চাদে।”। [তিরমিযী, অধ্যায় দাআওয়াত, অনুচ্ছেদ নং ৭৯, হাদীস নং (৩৪৯৯)] হাদীসটিকে স্বয়ং ইমাম তিরমিযী হাসান বলেছেন এবং শাইখ আলবানীও হাসান বলেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুয়ায (রাযিঃ) কে অসিয়ত করেন, সে যেন প্রত্যেক নামাযের পশ্চাদে বলেঃ “আল্লাহুম্মা আইনী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা”। অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনার যিকর, আপনার কৃতজ্ঞতা এবং আপনার উত্তম ইবাদত করতে আমাকে সাহায্য করুন। [আবু দাউদ, স্বালাত অধ্যায়, ইন্ডিগফার অনুচ্ছেদ নং (১৫২২), নাসাঈ, সূত্র সহীহ, ইবনু হিব্বান (২৩৪৫)] উল্লেখ্য যে, মুআয (রাযিঃ) কে অসিয়তকৃত বাক্যগুলি দুয়ার বাক্য।

আবু দাউদ সহীহ সূত্রে আলী বিন আবী তালিব (রাযিঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামাযে সালাম ফিরাতেন, তখন বলতেনঃ “আল্লাহুম্মাগ্ ফি’লী মা কাদ্মাতু ওয়া মা আখ্বারতু, ওয়া মা আসরারতু, ওয়া মা আ’লানতু, ওয়া মা আসরাফতু, ওয়া মা আন্দা আ’লামু বিহী মিনী, আন্দাল মুকাদ্দিমু ওয়া আন্দাল মুআখ খিরু, লা ইলাহা ইল্লা আন্দা”। [আবু দাউদ, স্বালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ সালাম ফিরানোর পর মানুষ যা বলবে, সূত্র সহীহ, তিরমিযী দাআওয়াত নং (৩৪১৯)] অর্থঃ “হে আল্লাহ! আমি যে সব গুনাহ অতীতে করেছি, পরে করেছি, গোপনে করেছি, প্রকাশ্যে করেছি, সীমালঙ্ঘনে করেছি, তা তুমি মাফ করে দাও। মাফ করে দাও আমার সেই সব গুনাহ যা তুমি আমার অপেক্ষা বেশী জানো, তুমি যা চাও আগে কর এবং যা চাও পিছে কর, তুমি ছাড়া উপসনাযোগ্য কোনো সত্য মার্বুদ নেই”।

ইবনুল ক্বায়্যিম (রাহেঃ) উপরোক্ত দুয়াটির সম্পর্কে সহীহ মুসলিমের বরাতে বলেনঃ মুসলিমের বর্ণনানুযায়ী দুটি শব্দ এসেছে। এক, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা তাশাহুদ ও সালামের মাঝে বলতেন। দুই, সালামের পর বলতেন। অতঃপর তিনি উভয়ের সমন্বয় করতঃ বলেনঃ মনে হয়, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় স্থানে বলতেন।

[যাদুল মাআদ, ১/২৯৭]

ইমাম বুখারী কিতাবুত দাআওয়াতে, নামাযের পরে দুয়া করা শিরোনামে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন এবং বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার এই অনুচ্ছেদ সম্পর্কে মন্ডব্য করে বলেছেনঃ এই অনুচ্ছেদ তাদের খন্ডন করে, যারা মনে করে যে, নামাযের পর দুয়া করা বৈধ নয়।

[ফাতহুল বারী, ১১/১৫৯]

উপরোক্ত দলীল-প্রমাণের আলোকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, ফরয নামাযে সালামের পর দুয়া করা বৈধ। কিন্তু তা হাত তুলে করতে হবে না সম্মিলিত ভাবে করতে হবে, এর প্রমাণ উপরোক্ত দলীল সমূহে উল্লেখ্য নি।

উল্লেখ্য যে, ইমাম ইবনু তাইমিয়া হাদীসে উল্লেখিত শব্দ (দুবরুস্বালাত) নামাযের পশ্চাদে দুয়া করা বলতে নামাযের শেষাংশে সালামের পূর্বে তাশাহুদে দুয়া করা মনে করেছেন। অর্থাৎ এসকল দুয়া নামাযের ভিতরে হবে নামাযের পরে নয়। তাঁর মন্ডব্য হল, দুবুর (পশ্চাদ) শব্দটি কবুল (সম্মুখ) এর বিপরীত। আর কোনো কিছুর দুবুর বলতে সেই বন্ডুর পশ্চাদ বুঝায়, যা তার সাথে মিলিত থাকে তা থেকে পৃথক থাকে না। যেমন মানুষের পশ্চাদ বা পাছা, যা মানুষের সাথেই মিলিত, মানুষ থেকে পৃথক নয়। তাই নামাযের পশ্চাদে দুয়া করা অর্থ হবে নামাযের শেষাংশে দুয়া করা, নামায শেষ করার পর নয়। কারণ সালামের পর দুয়া করলে দুয়া নামাযের বাইরে হয়, নামাযের পশ্চাদে হয় না। কিন্তু তাঁর এই মত সরাসরি গ্রহণীয় নয় কারণ; দুবুর (পশ্চাদ) শব্দটির অর্থ যেমন সেই বিষয়ের পাছা বুঝায়, যা তার

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৫৯

সাথে মিলিত থাকে, তেমন কোনো কিছুই পশ্চাদ বুঝায়, যা তা থেকে পৃথক থাকে। ইবনু হাজার (রহ) বলেনঃ ‘আমরা বলেছি প্রত্যেক নামাযের (দুবুরে) পশ্চাদে যিকরের আদেশ এসেছে। আর এর অর্থ সর্বসম্মতিক্রমে সালামের পর’। [ফাতহুল বারী, ১১/১৬০] অর্থাৎ তিনি বলতে চাচ্ছেন, নামাযের পর যে যিকর সমূহ করতে বলা হয়েছে, তাতেও দুবুরুস স্বালাত (নামাযের পশ্চাদে) শব্দটি এসেছে এবং উলামাদের ঐক্যমতানুযায়ী এখানে দুবুর অর্থ নামাযের পর। তাই দুয়া যেমন নামাযের শেষাংশে সালামের পূর্বে করা বৈধ তেমন নামায শেষে সালামের পরেও করা বৈধ।

৩.কোনো সময়ে বা স্থানে দুয়ার প্রমাণ থাকলেই কি হাত তুলে দুয়া করা বৈধ হয়?

আমরা অনেকে মনে করি যে, কোথাও দুয়ার প্রমাণ থাকলেই মনে হয়, হাত তুলে দুয়া করতে হয় বা তুলা বৈধ হয়। দুয়ার প্রমাণ যেহেতু আছে, তাই হাত তুলে দুয়া করলে অসুবিধা কি? তাছাড়া সমাজে অনেকের নিকট দুয়া মানে হাত তুলে চাওয়া। হাত না তুলেই আল্লাহর নিকট চাওয়া যায়, এটা তাদের ধারণাই নেই। অতঃপর দুয়ার প্রমাণ পেলেই হাত তুলার পক্ষে সেই আম হাদীসও দলীল হিসাবে পেশ করা হয় যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ “ অবশ্যই তোমাদের রব্ব লজ্জাশীল, ত্রুটি গোপনকারী, বান্দা যখন দুই হাত তুলে তার নিকট চায়, তখন তিনি তাদের শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা করেন”। [তিরমিযী নং ৩৫৫৬]

আমাদের মনে রাখা উচিত যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বহু স্থানে ও বিভিন্ন সময়ে দুয়ার প্রমাণ এসেছে কিন্তু তিনি এসব ক্ষেত্রে অনেক স্থানে হাত তুলেছেন আর অনেক স্থানে তুলেন নি। তাই তাঁর সুন্নতের প্রতি আমল করতে হলে, আমাদের সেই সব স্থানে হাত তুলা উচিত যেখানে তিনি তুলেছেন আর যেখানে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুলেন নি সেখানে না তুলাই সুন্নাহ। নিম্নে কিছু এমন সময় ও স্থানে দুয়ার বর্ণনা দেওয়া হল, যেখানে দুয়া প্রমাণিত কিন্তু হাত তুলা প্রমাণিত নয়ঃ

অযু শেষে দুয়া করা প্রমাণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাহাদাতাইন পাঠ করতেন এবং বলতেনঃ “হে আল্লাহ! আমাকে তাওবা কবুলকারীদের অশুভভুক্ত করো এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের দলভুক্ত করো”। [মুসলিম (২৩৪) তিরমিযী (৫৫)] কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ স্থানে দুই হাত তুলে সেই দুয়া করতেন না।

তাওয়াফ করার সময় দুয়া করা প্রমাণিত, বিশেষ করে রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেনঃ (হে আমাদের রব্ব! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও , আখেরাতে কল্যাণ দাও এবং জাহান্নামের আযাব থেকে পরিত্রাণ দাও)। [বাক্বারা/২০১] কিন্তু তিনি এখানে হাত না তুলেই এই দুয়া করতেন।

জুমআর খুতবায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দুয়া করা প্রমাণিত, কিন্তু তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে হাত তুলে দুয়া করতেন না। [মুসলিম, নং ৮৭৪] তবে এই সময় ইপিডসকার (বৃষ্টির জন্য দুয়া-প্রার্থনা) করলে তিনি দুই হাত তুলে দুয়া করতেন। [বুখারী, ইপিডসকা অধ্যায়, নং ৯৩৩]

সফর শুরু করার সময় এবং বাহনে আরোহণকালে দুয়া করা প্রমাণিত কিন্তু হাত তুলা প্রমাণিত নয়। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বাহনে পা রাখতেন তখন বিসমিল্লাহ বলতেন। আর আরোহণ করলে বলতেনঃ আল্ হামদু লিল্লাহিল্লাযী সাখখারা লানা.. [তিরমিযী নং ৩৪৪৩] আরো বলতেনঃ আল্লাহুম্মা ইন্ন্য নাসআলুক্য ফী সাফারিনা হায্য! [মুসলিম হাজ্জ অধ্যায় নং ১৩৪২]

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৬০

নামাযের মধ্যেই রুকু, সাজদা এবং তাশাহহুদে দুয়া প্রমাণিত কিন্তু হাত তুলে প্রমাণিত নয়। আরো ও বহু স্থানে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে দুয়া প্রমাণিত কিন্তু হাত তুলে অপ্রমাণিত যেমন, মসজিদে প্রবেশের সময় এবং বের হওয়ার সময় দুয়া, বাড়িতে প্রবেশ কালে এবং বের হওয়ার সময় দুয়া, শৌচালয়ে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় দুয়া, বিছানায় ঘুমাবার পূর্বে দুয়া এমন কি স্ত্রী সহবাসের সময় দুয়া। এসব স্থানে দুয়া প্রমাণিত কিন্তু হাত তুলে প্রমাণিত নয়।

তাই এমন মত পোষণ করা ভুল যে, ফরয সালামাশেড় যেহেতু দুয়ার প্রমাণ রয়েছে তাই হাত তুলে দুয়া করা যায় বা করা ভাল। কারণ এটি একটি দুয়ার এমন স্থান যাতে দুয়ার প্রমাণ তো রয়েছে কিন্তু হাত তুলার প্রমাণ নেই। যেমন উপরোক্ত একাধিক প্রমাণে একাধিক স্থানে দুয়া করা সাব্যস্ত কিন্তু হাত তুলে সাব্যস্ত নয়।

শাইখ সালিহ ফাউযান (হাফেঃ) বলেনঃ “অতঃপর এই যিকর সমূহ শেষ করার পর চুপি চুপি যা ইচ্ছা দুয়া করবে। কারণ এমন ইবাদতের পর এবং এসব মহান যিকরের পর দুয়া বেশী কবুল হওয়ার সম্ভাব্য স্থান। অতঃপর ফরয নামায শেষে দুয়ার সময় দুই হাত তুলবে না, যেমন অনেকে করে; কারণ এটি বিদআত। এটা কখনো কখনো নফলের পর করা যায়”। [আল্ মুলাখ্বাস আল্ ফিক্বহী/৭৯]

৪.কোনো সময়ে বা স্থানে দুয়ার প্রমাণ থাকলেই কি সম্মিলিত ভাবে দুয়া করা বৈধ হয়?

আমরা যখন উপরোক্ত আলোচনায় বুঝতে সক্ষম হয়েছি যে, দুয়ার প্রমাণ থাকলেই হাত তুলে বৈধ হয় না, তখন বর্তমান প্রসঙ্গ বুঝতে আশা করি সহজ হবে যে, কোথাও দুয়ার প্রমাণ থাকলেই তা সম্মিলিত ভাবে করা বৈধ হবে না; যতক্ষণে সম্মিলিত আকারে করার প্রমাণ না পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ জুমআর খুত্বায় দুয়া করা। এই সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় সব খুত্বাতে দুয়া করতেন কিন্তু তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত তুলতেন না আর না নামাযীগণ তুলতেন। কিন্তু এই স্থানেই যখন ইঙ্গিড়সকা তথা বৃষ্টি চাওয়ার দুয়া করলেন, তখন তিনি ও উপস্থিত সাহাবীগণ সকলে হাত তুলে দুয়া করলেন। তাই যেখানে ও যেই সময়ে তিনি সম্মিলিত ভাবে দুয়া করলেন, আমাদের সেখানে সম্মিলিত আকারে করা সুন্নত আর যেখানে তিনি একা একা করলেন সেখানে একা একাই করা সুন্নত।

একটি আরোও সুস্পষ্ট উদাহরণ উল্লেখ করা ভাল মনে করছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজারো সাহাবীকে সাথে নিয়ে হজ্জ পালন করছেন এবং বলছেন “তোমরা আমার কাছ থেকে হজ্জের নিয়ম জেনে নাও” [মুসলিম ১২৯৭] এই হজ্জ পালনের সময় তিনি বহু স্থানে দুয়া করেছেন। তন্মধ্যে ৬য় স্থানে তাঁর হাত তুলার প্রমাণ এসেছে। ১-সাফাতে ২-মারওয়াতে ৩-আরাফার দিনে সন্ধ্যা ৪-মুযদালিফায় ফজরের পর ৫- তাশরীকের দিনগুলিতে ছোট জামরায় পাথর মারার পর ৬- মধ্যম জামরায় পাথর মারার পর। [তাস্বহীহুদ দুয়া/৪৩৭]

লক্ষণীয় হচ্ছে, উক্ত স্থান সমূহে দুয়ার প্রমাণ রয়েছে এবং হাত তুলারও প্রমাণ রয়েছে কিন্তু সম্মিলিত ভাবে দুয়ার প্রমাণ মিলে না; অথচ সাহাবাদের একটি বড় সংখ্যা তাঁর সাথে রয়েছেন। না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে নিয়ে দুয়া করছেন আর না সাহাবাগণ তাঁর সাথে দুয়ায় শরীক হয়ে আমীন আমীন বলছেন। যা দ্বারা বুঝা যায় যে, দুয়া করার সময় ও স্থান এবং তাতে হাত তুলার প্রমাণ থাকলেও সম্মিলিত রূপ দেওয়া বৈধ নয়। যেমন আমাদের অনেক অজ্ঞ ভাই বিশেষ বিশেষ সমাবেশের সময় বলে থাকেঃ বহু লোকের সমাগম হয়েছেআল্লাহ্কারো না কারো দুয়া কবুল করবে তাই দুয়া করে দিন বা এই ধরনের

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৬১

অন্য যুক্তি। অথচ এসব বৈঠক ও সমাবেশ দুয়া কবুলের স্থান হিসাবে প্রমাণিত নয়। আর তা না হলে হাত তুলে দুয়া করা ও সম্মিলিত ভাবে করা দূরের প্রশ্ন।

যারা এসব ক্ষেত্রে সাধারণ সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করে ফরমায়েশী দুয়ার আবেদন করে হাত তুলে সম্মিলিত দুয়া করেন, তাদের জন্যও একটি নব্বী সুন্নত পেশ করতে চাই। এসব সাধারণ অবস্থা নয় বরং জিহাদ-কিতালের সময় হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় ৩১৪ জন সাহাবীকে সাথে নিয়ে বদর প্রাঙ্গনে হাজির হয়েছেন। শত্রুদের সংখ্যা হাজারেরও অধিক। তাদের যুদ্ধ সরঞ্জামও অনেক বেশী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে মহান আল্লাহর নিকট অতি কাকুতি-মিনতি সহকারে দুয়া করেন। তিনি তার দুয়ায় বলেনঃ হে আলল্হু! ইসলামের এই গোষ্ঠী যদি আজ ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তোমার জমিনে ইবাদত করার আর কেউ থাকবে না। এই দুয়ার এমনই অবস্থা ছিল যে, তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে যায়। এই সময় আবু বাকর (রাযিঃ) চাদর তুলে আল্লাহর রাসুলের কাঁধ ঢেকে দেন এবং বলেনঃ হে আল্লাহর নবী! যথেষ্ট হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করবেন। [বুখারী ও মুসলিম]

তো এমন অবস্থাতেও কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের সাথে নিয়ে দুয়া করলেন? আর না সাহাবাগণ পিছন থেকে এসে তাঁর সাথে দুয়ায় শরীক হলেন? এমন কি আবু বাকর পাশে থাকা সত্ত্বেও কি তাঁর সাথে দুয়ায় শরীক হলেন? আর না কেউ ফরমাইশ করল যে, কাল যুদ্ধ তাই একটু দুয়া করে দিন। তাই বলছিলাম ছোট-খাট অজুহাতকে কেন্দ্র করে সম্মিলিত দুয়ার অভ্যাসও পরোক্ষভাবে বিদআতী দুয়ারই অশুভ্রুজ।

৫. ফরয নামায শেষে দুয়ার দলীলগুলির অবস্থাঃ

যারা ফরয নামায শেষে সম্মিলিত দুয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন, তারা কিছু দলীল পেশ করে থাকেন। কিন্তু সত্যিকারে সে সব দলীল মূলতঃ দলীল নয়; কারণ হয় সেগুলো জাল, যয়ীফ কিংবা সে সবের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিম্নে এসব প্রমাণের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলঃ

ক-আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর হতে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে নামায শেষ করার পূর্বে দুই হাত তুলে দুয়া করতে দেখেন। যখন সে নামায শেষ করে, তখন তিনি তাকে বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দুই হাত নামায শেষ করার পূর্বে তুলতেন না।

[ত্বাবারী, মুজাম আল কাবীর, ১৩/১২৯]

কিন্তু হাদীসটি যয়ীফ কারণ; বর্ণনাকারীদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন আবী ইয়াহইয়া ও আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিঃ) এর মধ্যে সূত্র বিচ্ছিন্ন (মুনকাত্বা)। তাছাড়া ইবনু আবী ইয়াহইয়াকে একমতানুযায়ী প্রত্যাখ্যাত (মাতরুক) রাবী বলা হয়েছে এবং তার থেকে বর্ণনাকারী ফুযাইল বিন সুলাইমান নামক অপর রাবীর স্মরণশক্তি ও দুর্বল প্রকৃতির। তাই হাদীসটি সূত্র বিচ্ছিন্নতা এবং দুর্বলতার দোষে দুশণীয়া। তাছাড়া সেই হাত তুলে না ফরযান্বে হুবে তাও বর্ণিত হয় নি। আর না তাতে সম্মিলিত দুয়ার কথা আছে।

খ-ইয়াযীদ বিন আসওয়াদ আল্ আমেরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ফজরের নামায আদায় করলাম। যখন তিনি সালাম ফিরালেন, মুখ ফিরে বসলেন এবং দুই হাত তুললেন এবং দুয়া করলেন।” [ইলাউস সুনান, ৩/২০৭]

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৬২

পর্যালোচনাঃ উপরোক্ত হাদীসের শেষাংশ আভার লাইন করা হয়েছে, “এবং দুই হাত তুললেন এবং দুয়া করলেন।” এই বাক্যটি হাদীসের মূল গ্রন্থে নেই। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ বই ইলাউস্ সুনান সহ অন্য মুতআখিখর বইতে বাক্যটি আছে। কিন্তু হাদীসের মূল গ্রন্থ যা থেকে হাদীসটি সংকলন করা হয়েছে, তাতে এই বর্ণিত বাক্য নেই। আর এই বর্ণিত বাক্য না থাকলে হাদীসটি নামাযের পর একা বা সম্মিলিত ভাবে হাত তুলে দুয়া করার প্রমাণই হতে পারে না। হাদীসটির মূল গ্রন্থ হচ্ছে মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা। আর তাতে **দুই হাত তুললেন এবং দুয়া করলেন বাক্যটি নেই।** [বর্ণিত অংশ ছাড়াই হাদীসটি দেখুন, আবু দাউদ, স্বালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ সালামের পর ইমাম ঘুরে বসবে, নং ৬১০/মুসনাদ আহমদ ৪/১৬০-১৬১, ইবনু আবী শায়বা, ১/৩০২ ও ১৪/১৮৬]

অনেকে এটা সালাম শেষে দুয়ার গোঁড়া সমর্থকদের কারচুপি মনে করেন, যারা নিজ মতের সমর্থনে হাদীসে কারচুপি পর্যন্ত করেন। উপরোক্ত বর্ণনাটির সম্পর্কে বিস্ফুরিত দেখুন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা স্বাহীহ ত্বারীকায়ে নামায, রাইস নাদভী, পৃঃ ৫৪৩-৫৪৭ এবং তাস্বহীহুদ দুয়া পৃঃ ৪৪১।

গ-ফযল বিন আক্বাস থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ “নামায দুই দুই রাকাআত, প্রত্যেক দুই রাকাআতে তাশাহুদ হবে। বিনয়, বিন্মাতা, অসহায় প্রকাশ পাবে এবং দুই হাত তুলতে হবে। অতঃপর বর্ণনাকারী বলেনঃ তুমি উভয় হাতকে মহান রব্বের দিকে এমন ভাবে তুলবে যেন, হাতের অভ্যঙ্গীর্ণ ভাগ চেহারার দিকে থাকে এবং বলবেঃ হে আমার রব্ব! হে আমার রব্ব! আর যে এমন করবে না, তার নামায এমন হবে এবং এমন হবে।” [তিরমিযী, স্বালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নং ২৭৯, হাদীস নং ৩৮৩]

পর্যালোচনাঃ তুহফাতুল আহওয়ায়ীর লেখক মুবারকপুরী বলেনঃ এই হাদীসটি আব্দুল্লাহ বিন নাফি বিন ইবনুল উমইয়ার উপর ভিত্তিশীল। আর সে অজ্ঞাত রাভী যেমন হাফেয বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেনঃ তার হাদীস স্বহীহ নয়। ইবনে হিব্বান তাকে আস্ সিক্বাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন”। [তুহফাতুল আহওয়ায়ী, ২/৩২৮] তাছাড়া হাদীসটি সহীহ হলেও তা নফল তথা রাতের নামাযকে বুঝায়; কেন না তাতে দুই দুই রাকাআতের বর্ণনা এসেছে অন্যদিকে ফজর নামায ছাড়া সব ফরয নামায দুইয়ের বেশী।

ফরয নামাযাশেদু হাত তুলে সম্মিলিত আকারে দুয়ার সমর্থনে উপরোক্ত দলীলগুলি ছাড়া আরো কিছু দলীল ও সাহাবার আসার দ্বারা দলীল দেওয়ার চেষ্টা করা হয় কিন্তু সবগুলির অবস্থা এমন যা হাদীসবিমারদদের নিকট অগ্রহণীয়।

৫. উপরোক্ত আলোচনার সারাংশঃ

উপরোক্ত দলীল-প্রমাণের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, ফরয নামাযে সালাম ফিরানোর পরের সময়টি যেমন যিকর-আযকার করার সময় তেমন এই সময় দুয়ারও সময় কিন্তু এই দুয়া একা-একা চুপি চুপি হবে এবং তাতে হাত তুলার প্রমাণিত নয় আর না সম্মিলিত ভাবে করা প্রমাণিত। তাই যে বা যারা এই সময় হাত তুলে ইমামের নেতৃত্বে সম্মিলিত ভাবে দুয়া করে তারা এই দুয়া করার নিয়ম-পদ্ধতি আবিষ্কারক, যা দ্বীনে নবাবিষ্কার। তাই তা বিদআহ ও প্রত্যাখ্যাত।

৬. সউদী স্থায়ী ফতোয়া বোর্ড কি বলে?

সউদী স্থায়ী উলামা পরিষদকে প্রশ্ন করা হয়, ফরয নামায বাদ দুয়া করা কি সুন্নত, এই দুয়া কি দুই হাত তুলে হবে?

তাঁরা উত্তরে বলেনঃ ফরয নামায বাদ দুয়া সুন্নত নয়, যদি তা হাত তুলে হয়। চাই এটা একা ইমামের পক্ষ থেকে হোক, কিংবা একা মুখ্বল্গীর পক্ষ থেকে হোক কিংবা উভয় কর্তৃক হোক; বরং এটা বিদআত। কারণ এমন করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৬৩

বর্ণিত নয়, আর না তাঁর সাহাবা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। এ ছাড়া দুয়াতে সমস্যা নেই এ সম্পর্কে কতিপয় হাদীস উল্লেখ্যাকার কারণে। [ফাতাওয়াল লাজনা আদ দায়িমাহ, ৭/১০৩]

আব্দুল্লাহিল হাদী

প্রশ্ন: জুমার দিন জুমার সালাত আদায়ের আগে ওয়াজ-নসীহত করার বিধান কি?

উত্তর: জুমার দিন জুমার নামাজের আগে ওয়াজ-নসীহত বা দরস প্রদান করা উচিত নয়। কারণ প্রখ্যাত সাহাবী আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন,
الصَّلَاةُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ يَوْمَ التَّلَاقِ عَنْ نَهْيِ

রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার সালাতের আগে (ওয়াজ-নসীহতের) বৈঠক করতে নিষেধ করেছেন।”(তিরমিযী, অধ্যায়: সালাত হা/৩৩২, নাসাঈ, অধ্যায়: মসজিদ হা/৭১৪, আবুদাউদ, অধ্যায়: সালাত হা/১০৭৯, হাদীসটি হাসান, সুযুতী ও আলবানী রহ)

কারণ, এটি জুমার সালাতের জন্য উপস্থিত মুসল্লীদেরকে যিকির, কুরআন তিলাওয়াত, নফল সালাত, কাতার বন্ধ হয়ে বসা এবং যে খুতবা শুনার জন্য মহান আল্লাহতার রাসূলের মাধ্যমে আমাদেরকে আদেশ করেছেন সেই খুতবা শোনার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণে অমনোযোগী করে তোলে।

খুতবার আগে যদি নিয়মিতভাবে এবং অধিক পরিমাণে ওয়াজ-নসীহত করা হয় তবে মানুষের অন্তরে জুমার খুতবার মর্যাদা এবং প্রভাব কমে যায়। সুতরাং এটা করা হলে আল্লাহতায়ালা যে উদ্দেশ্যে এই খুতবার ব্যবস্থা করেছেন সে উদ্দেশ্যে পরিপন্থী কাজ হবে। তাছাড়া জুমার সালাতের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তি (ইমাম বা খতীব সাহেব) যদি খুতবার মধ্যে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ওয়াজ-নসীহত পেশ করার প্রতি যত্নবান হন তবে খুতবার আগে অন্য কোন ওয়াজ-নসীহতের প্রয়োজন থাকে না।

তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তারা খোলাফায়ে রাশেদাগণ এমনটি করতেন না। অথচ প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শের অনুসরণেই মধ্যেই।

অবশ্য যদি বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা যায় অথবা তা যদি জুমার সালাত বা খুতবা সংশ্লিষ্ট হয় তবে এতে কোন অসুবিধা নাই। তবে সতর্ক থাকতে হবে যে, এটা যেন প্রতিনিয়ত এবং নিয়মিত না করা হয়। তাহলে এ ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ কোন সমস্যা নাই। আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

ফতোয়া প্রদানকারী:

প্রধান: আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন বায

উপ-প্রধান: আবুর রায়যাক আফীফী

সদস্য: আবদুল্লাহ বিন হাসান বিন কুউদ।

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৬৪

অনুবাদক:

আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল

দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সউদী আরব।

-উৎস: ফতোয়া এবং গবেষণা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, সউদী আরব

{অবশ্য যদি বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা যায় অথবা তা যদি জুমার সালাত বা খুতবা সংশ্লিষ্ট হয় তবে এতে কোন অসুবিধা নাই। তবে সতর্ক থাকতে হবে যে, এটা যেন প্রতিনিয়ত এবং নিয়মিত না করা হয়। তাহলে এ ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ কোন সমস্যা নাই। আল্লাহই তাওফীক দানকারী। কেউ কেউ এই দুর্বল সূত্রে আসা আছারটি থেকে মত প্রকাশ করেছেন যে, দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরে ফারুক (রাযি.) এর জামানায় তার খুতবার পূর্বে হাজার হাজার সাহাবায়ে কেরামের (রাযি.) উপস্থিতিতে হযরত তামীমে দারী (রাযি.) আবার কখনো হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বয়ান রাখতেন। কখনো অন্য সাহাবীও বয়ান করতেন। কেউ এতে আপত্তি করেন নি। সুতরাং এটা বিদআত বা না জাযিয় হতে পারে না। তবে এ বয়ানটি মসজিদের মিম্বরে না হয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বা চেয়ারে বসে করবে। যাতে জুমার খুতবা দুইটির স্থলে তিনটির মতো না দেখায়। সুতরাং এই বিষয়টির প্রতিও সবার খেয়াল করা দরকার। কোথাও বিদআতের ভয়ে বয়ানই করা হয় না। আবার কোথাও মিম্বরে বসে এই বয়ান করা হয়। উভয়টিই ভুল তরীক। --[মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. ৫৪৩৩; মুসতাদরাকে হাকেম, হা. ৩৬৩; তারীখে ইবনে আসাকির, ১১/৮০] }

ইমাম সাহেবের মাতৃ ভাষায় জুমার খুতবা দেয়ার বিধান

আব্দুল্লাহিল হাদী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার খুতবায় আল্লাহর তারীফ করতেন, দরুদ পড়তেন, কুরআন থেকে তেলাওয়াত করতেন এবং কিছু ওয়াজ-নছীহত ও করতেন। নবীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

لَهُمْ لَبَيِّنٌ قَوْمِهِ بِلِسَانٍ إِلَّا رَسُولٌ مِّنْ أَرْسَلْنَا وَمَا

“আমি সব নবীকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারে।” (সূরা ইবরাহীম: ৪)

ওসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাতৃভাষা যেহেতু আরবী ছিল এবং ছাহাবীদেরও ভাষা আরবী ছিল, তাই তিনি আরবীতেই তাদেরকে নছীহত করতেন। এখন যারা নবীজির নায়েব হয়ে জুমার খুতবা দিবেন তাদেরকেও উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ অনুসারে তাদের শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে

মাতৃভাষায় খুতবা দেয়াটা শরীয়ত সম্মত এবং যুক্তি সংগত।

* এই কারণেই ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন: প্রত্যেক খতীবকে জুমার সময়তাঁর মাতৃভাষায় ওয়াজ করা ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য। (তানক্বীহুর রুওয়াত ১/২৬৪)

* আল্লামা তাহাভী হানাফী বলেন: জুমার খুতবা আরবী জানলেও ফারসী ভাষায়ও চলবে। (হাশিয়া তাহতাবী আলা মারাক্বিল ফালাহ ২৭)

* আল্লামা আব্দুল হাই লাখনভী হানাফী (রহ.) বলেন: শ্রোতাদেরকে তাদের মাতৃভাষায় খুতবা বুঝিয়ে দেয়া জাযেজ। (মাজমুআহ ফাতাওয়া ১/২৪৫)

ইমাম, ইমামতি ও মুক্তাদীর করণিয় ৬৫

- * হানাফী ফিক্‌হ গ্রন্থ নিহায়া, মুজতাবা, ফাতাওয়া সিরাজিয়াহ, মুহীত প্রভৃতি গ্রন্থে আছে যে, ইমাম আবু হানীফার মতে ফারসী ভাষাতে জুমার খুতবা দেয়া জায়েজ।
- * হানাফী ফতোয়ার কিতাব শামীতে আছে, আরবী ভাষায়খুতবা দেয়া শর্ত নয়।
- * হানাফী ফিক্‌হ গ্রন্থ হিদায়য়াহ, প্রত্যেক ভাষায়খুতবার নছীহত চলতে পারে। (কিতাবুল জুমআহ ৫৫-৫৬) (আলোচনা দ্র: আইনী তোহফা সলাতে মুস্‌ড়ফা ১/৯৮-৯৯)

খুতবারা আগে নিয়মিত বয়ান একটি বিদআত:

নিজ ভাষায়খুতবা না দেয়ার কারণে যেহেতু তা মানুষের বোধগম্য হয়না এজন্যই এই খুতবার আগে খতীবগণ বয়ানের ব্যবস্থা রেখেছেন, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি জঘন্যতম বিদআত। কারণ খুতবা দানের পূর্বে বয়ান দেয়া এবং ইহাকে এভাবে স্থায়ী রূপ দেয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আদৌ প্রমাণিত নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবার পূর্বে কখনো এ ধরনের বয়ান দেন নি। দিতে বলেছেন বলে ও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না।

এজন্যই এ সউদী আরবের বরেণ্য মুফতী শাইখ ইবনে উসাইমীন (রহ:)কে মাতৃভাষায়খুতবা প্রদান সম্পর্কে সওয়াল করা হলে তিনি তা সরাসরি জায়েজ বলে মন্তব্য করেন এবং একথা স্পষ্ট ভাবে বলেন যে, খতীবকে নিজ ভাষায়খুতবা দিতে হবে। (দেখুন: শাইখ ইবনে উসাইমীনের ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম)

বর্তমানে আমাদের দেশের বেশ কিছু জামে মসজিদে মাতৃভাষায়খুতবা দেয়া হয়ে থাকে। বস্তুত এটাই সুন্নত। এর বিপরীত সুন্নত বিরোধী কাজ যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক ইলম দান করুন এবং যাবতীয়বিদআত পরিত্যাগ করার

তাওফীক দিন

(আমীন)

লেখক: শাইখ আখতারুল আমান বিস আব্দুস সালাম

সম্পাদনা: আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল